নতুন চীনের ছোটগল্প

[চীনের বিখ্যাত কয়েকখানি
উড়কাট সংবলিত]

অনুবাদঃ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটঃঃ কলিকাতা ১২

দাম আড়াই টাকা

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই ডেকার্স লেন
কলিকাতা ১

ভূমিকা

অসমাপ্ত বিপ্লব জাতিকে দেয় না মুক্তি, ব্যক্তিকে দেয় না স্বস্তি; জীবনের পক্ষে তা অভিশাপ, ইতিহাসের তা অপচয়—চীনের গত পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস থেকে আমরা পাই তারই প্রমাণ। এরূপ 'এক অসমাপ্ত বিপ্লবের' বোঝা নিয়েই আজ আমরাও থম্‌কে দাঁড়িয়েছি আমাদের প্রান্তে। কিন্তু চীনের সেই রুদ্ধ-গতি জীবন-পর্ব আজ মুক্তপথে এসে পৌছচ্ছে। তার সেদিনকার সৃষ্টি ও সাধনা থেকে আমরাও আবার তাই বুঝি—বিপ্লবের দাবী অগ্রাহ্য করবার সাধ্য নেই কারো,—না রাষ্ট্রশক্তির, না শিল্পকর্মীর।

এই চীনা সঞ্চয়নে আছে তারই প্রমাণ—জীবনের পূজারী হিসাবে চীনা লেখকদের বিপ্লবকে স্বীকৃতি।

বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল চীনে ১৯১১ সালে, কিন্তু মাঞ্চু রাজবংশই তখন বিদায় নেয়, চীন গণতন্ত্র জন্মাতে পারল না। সোভিয়েটের শিক্ষা আর প্রেরণা নিয়ে আবার জনমুক্তির আয়োজন করেন ডাক্তার সান ইয়াৎ-সান। চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম প্রকাশ হয় তাই সেই নতুন পর্বে—১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে। সে মহৎ সম্ভাবনাকে চিয়াং কাইশেক ও কুয়োমিণ্ডতাঙ-নেতারা ডুবিয়ে দিল প্রতিবিপ্লবের রক্ত-সমুদ্রে। তারপর দীর্ঘ বিভীষিকা সেই চীনা ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বের ১৯৩৬ পর্যন্ত। তারপরে আছে স্বল্পকালস্থায়ী "জাপ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য" কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রী নেতা মাও জে তুঙ্-এর সঙ্গে (১৯৩৬-৩৯); মহা-যুদ্ধের মধ্যেই চিয়াং-এর চক্রান্ত সে গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য; আর যুদ্ধশেষে মার্কিন ডলার ও বোমা-বারুদের জোরে নতুন অভিযান চীনা গণতন্ত্রী ও চীনা কমিউনিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে (১৯৪৩) আজ ১৯৪৭-৮-এ চীনের

সেই 'অসমাপ্ত বিপ্লব' সমাপ্ত হতে চলেছে ; সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে চীনের "নব্য গণতন্ত্র।"

চীনা বিপ্লবের পর্বে পর্বে চীনা সাহিত্যেরও ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে গিয়েছে চীনের সাহিত্যিকদের দানে। বিপ্লবকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁরাই করেছেন স্বাগত—রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে ; দিয়ে তাঁদের প্রতিভার দান, তাঁদের দুর্জয় সংকল্প। অতীত ঐতিহ্যের নিগড়ে বাঁধা ছিল বরাবর চীনা মন ও চীনা ভাষা: কিছুতেই চল্‌তি কাল ও চল্‌তি ভাষাকে স্বীকার করবে না। সেই বাঁধ ভাঙ্‌ল ১৯১৯-এর "চৌঠা মে-র আন্দোলনে।" জাপ-বিরোধী রাষ্ট্রীয় আলোড়নের সেই আঘাতে চীনের চল্‌তি ভাষা "পাই-হুআ" তখন স্বীকৃত হল সাহিত্যের ভাষারূপে। সাহিত্য-বিপ্লবের সূচনা হল এই প্রথম। তখন নেতৃত্ব করছিলেন হুঁ শি ; কিন্তু আসল নেতৃত্ব তখনি গ্রহণ করলেন লু সুন (১৮৮১-১৯৩৫)—নতুন চীনের সাহিত্যজগতে যিনি অদ্বিতীয়। পৃথিবীর চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠকীর্তি তখন এই চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে লেগে যান চীনের শিক্ষিত লেখকেরা। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বনিয়াদ গাড়া চলল সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সান ইয়াৎ-সান যখন তাঁর পথ খুঁজছেন রাষ্ট্রীয় কর্মে, সামাজিক ক্ষেত্রে যখন জন্ম নিচ্ছে (১৯২১) চীনের শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি।

আশা-উৎসাহভরা মানবমুক্তির বাণী তখন বহন করছে চীনা সাহিত্য। প্রধানত তখনকার চীনা সাহিত্যে দেখা যায় দু'টি ধারা—যাদের সাধারণ ভাবে বলা যায় রোমাণ্টিক্ ও বাস্তববাদী। রোমাণ্টিকদের গোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র ছিল "সৃষ্টিপন্থী সমিতি," আর বাস্তববাদীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল "সাহিত্য-জিজ্ঞাসা সমিতি"। রোমাণ্টিকদের নেতা ছিলেন একদিকে কুয়ো মো-জো, যাঁর গদ্যে ছিল যথেষ্ট শক্তি ; অন্যদিকে বেদনা-বিলাসী

য়্যু তা-ফু, আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্-এর পাণ্ডারা ছিলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু বাস্তববাদীরা পান লু স্যুন্-এর নেতৃত্ব ; আর উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন সামাজিক চেতনায়, বাস্তববোধে।

এই "সাহিত্য-বিপ্লবের" পর্ব শেষ হয়ে গেল ১৯২৭-এ চিয়াং-এর প্রতিবিপ্লবে ; চীনের জীবনে এল বিভীষিকার যুগ ; আর সাহিত্যে দেখা দিল তারই প্রতিরোধে "বিপ্লবী সাহিত্যের" যুগ (১৯২৭-১৯৩৬)। শতে শতে তখন মাথা দিতে হয়েছে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সেবীদের। এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব নেন 'বামপন্থী লেখক-সংঘ,' আর তাদের পুরোধা হয়ে দাঁড়ান লু স্যুন্। প্রতিরোধে বাস্তববাদীরাই হন অগ্রণী, আর "সৃষ্টিপন্থীদলের"ও একাংশ হন সহযোগী। অন্যেরা ফ্যাশিস্ত বিভীষিকার মধ্যে পলায়ন-পথ খুঁজতে লাগলেন নানা নামে—কখনো "নাগরালি" নাম নিয়ে, কখনো (লিন্ য়্যু-তাঙ এর নেতা) "কৌতুকবাদী" নামে, কখনো "রাকা" নামে কাব্যান্দোলনে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা যেখানে গিয়ে পৌঁছেন তাতে আর তাঁদের আজ খোঁজই পাওয়া যায় না। সে পর্বের বামপন্থীদেরই হাতে চীন সাহিত্য এগিয়ে যায়—কেউ তাঁরা হত হন, কেউ হন বন্দী, কেউ নানা বাধা-নিষেধের ফাঁক দিয়ে লিখে চলেন সংকেতমূলক নানা কথা, গল্প, নাটক—আর গোড়াপত্তন করেন চীনা গণসাহিত্যের।

জাপ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এল গণসাহিত্যের যুগ। পূর্ব পর্বের স্রষ্টারা অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত, অগ্রগামী গণতন্ত্রী বা সাম্যবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু ১৯৩৬-এর পরে মাও জে-তুঙ-এর "নব্য গণতন্ত্র" ও গেরিলা-বাহিনীকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হতে লাগল সত্যকারের গণসাহিত্য। তার স্রষ্টারাও কৃষক বা শ্রমিকের সন্তান, গেরিলা বাহিনীর সেনানী। আর তাঁদের কথা-কাহিনীও রচিত হল সেই কিসান মজুর নিয়ে, বিপ্লবী জনতা নিয়ে।

চীন সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগ হল খাঁটি গণসাহিত্যের যুগ। তার দু-একজনার লেখা মাত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যেমন তিয়েন চ্যুন-এর "ভিলেজ ইন অগাস্ট"। কিন্তু চীনা সাহিত্যের এ ধ্বনি ইংরেজির মারফৎ না পৌঁছানতে আমরা এর বেশি সন্ধান পাই না। তবু আমরা দেখে অবাক্ হই, এ যুগের চীনা আর্ট, বিশেষ করে চীনা কাঠ-খোদাইর চিত্র—এ সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় দিতে চেয়েছেন প্রকাশক। এ প্রতিলিপি থেকে তার মূল্য সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না; তবু কিছুটা বোঝা যাবে তার আদর্শ। মনে রাখবার মত কথা এই—চীনারা শিল্পীর জাতি; সাহিত্যে ততটা নয়, চিত্রকলাই চীনের নিজস্ব ভাষা।

অনুবাদের পক্ষে এখনো আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে প্রধানত বামপন্থী যুগের লু সুন ও তাঁর অন্ধ সহযোগীদের। যতদিন ইংরেজির দৌত্য ত্যাগ করে আমরা চীনের সরাসরি পরিচয় গ্রহণ না করব ততদিন গত্যন্তর নেই, তা বুঝি। কিন্তু সেরূপ পরিচয়কে সুসাধ্য করবার জন্য কেন পাঁচটি করে আমাদের যুবকও চীনাভাষা, রুশভাষা প্রভৃতি প্রধান প্রধান জাতিদের ভাষাগুলো শিখতে ব্রতী হবেন না? তা হলে, নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারতাম—অনুবাদ যথার্থ। এখন বলতে হচ্ছে, পবিত্রবাবুর মত সুদক্ষ অনুবাদকের হাতে সার্থক হয়েছে এ চেষ্টা, মূল লেখকেরা মর্যাদা খোয়াননি; রসাস্বাদনে তৃপ্ত হয় মন। এ কথাও আরও বেশি করে বুঝি—নতুন চীনকে চিনতে হলে পার্ল বাক্‌ও যথেষ্ট নয়; আর লিন য়ু-তাং হচ্ছেন আসলে (অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ-এর মত) ভালো ইংরেজি লেখক—বিদেশীর মন মত চীনের পরিচয় লেখাই যাঁর কাজ। নতুন চীনকে সৃষ্টি করছে চীনা গণতন্ত্রী বাহিনী, আর সেই বাহিনীর সহযোগী চীনা শিল্পী ও সাহিত্যিকরা।

২৮-১-৪৮

গোপাল হালদার

লেখক পরিচিতি

॥১॥ **লু স্থন** (১৮৮১-১৯৩৫): নতুন চীনের শিল্প ও সাহিত্য জগতে লু স্থন অদ্বিতীয়। কেউ তাঁকে বলেন 'চীনের গোর্কি', কেউ বলেন 'চীনের শেখভ্'। দু-নামই সত্য। সত্য এও যে, তিনি চীনের সুইফ্‌ট। কিন্তু আরও সত্য এই যে, তিনি লু স্থন—চীনা সাহিত্যে নতুন যুগ পত্তন করেছেন ; মাথা পেতে নিয়েছেন চিয়াং-চক্রের সমস্ত আক্রোশ ; বুক দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছেন অনুজ সাহিত্যিকদের সেই খড়্গাঘাত থেকে—আর অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে যক্ষ্মায় তিলে তিলে মরেছেন সেই নিহত, আহত, বন্দী লেখকদের বেদনায়। বলা বাহুল্য, চীনের অনেক লেখকের মতই লু স্থন তাঁর "লেখক-নাম।" আর, সরকারী-নিষেধ এড়াবার জন্য অনেক লেখাই তাঁকেও অন্যান্যদের মত লিখ্‌তে হয়েছে অন্য নামে ; নানা সংকেতে আভাসে বল্‌তে হয়েছে তাঁর বক্তব্য।

॥২॥ **তিঙ লিঙ** (১৯০৫–)। নতুন চীনের লেখিকাদের মধ্যে তিঙ্ লিঙ্ প্রধান ; তাঁর নামও ইংরেজি পাঠক সমাজে সুপরিচিত। হুনান প্রদেশে গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম ; দুঃখে কষ্টে লেখাপড়া শিখে তিনি লেখিকা হন। তরুণ লেখক হু-ইয়ে-পিঙ্ ছিলেন তাঁর স্বামী ; শেন্ সুঙ্-ওয়েন্ তাঁদের বন্ধু—সবাই বিপ্লবের পথে সতীর্থ। কুয়োমিঙতাঙ্-এর ঘাতকদের হাতে তরুণ হু নিহত হন ; বন্ধু শেন্ ক্রমেই বিপ্লবের পথ ছেড়ে দিতে থাকেন ; আর ১৯৩৩-এ কুয়োমিঙতাঙ-চক্র তিঙলিঙ্‌কে গুম্ করে ফেলে নানকিংএ। ১৯৩৬-এ অবশ্য 'মিলিত ফ্রণ্টের' দিনে উদ্ধার হল জেল থেকে। তখন তিনি চলে আসেন মাও-জে-তুঙ-এর 'নব্য গণতন্ত্রী' চীন—য়িনানে। নতুন গণ-সাহিত্যের যুগে তাঁর লেখার সমৃদ্ধি কমে গিয়েছে বলে চীনের ইওরোপীয় "বন্ধুরা" দুঃখ করেন। তিঙ লিঙ্ কিন্তু বলেন—মাও-র প্রেরণায় পূর্বেকার মধ্যবিত্ত বামপন্থী সাহিত্য এখন পরিণত হয়েছে গণসাহিত্যে। (দ্রষ্টব্য—সুধাংশু দাসগুপ্তের লেখা—'চীনে সংস্কৃতির রূপান্তর', পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫৩)

॥৩॥ **মাও তুঙ্** (১৯০২—) ঃ এ ছাড়াও অন্যরূপ 'লেখক-নাম' আছে সেন্ য়িন-পিঙ্-এর। প্রুফ্ রীডার থেকে তিনি হন লেখক, বিপ্লবী, সম্পাদক,—চিয়াং তাঁকে বিতাড়িত করেন সে পদ থেকে। তাঁর ৯ খানা বই চীনে নিষিদ্ধ। লু সুন্-এর তিনি ছিলেন প্রধান সহকারী। লু সুন্-এর পরেই চীনা কথা সাহিত্যে তাঁর স্থান। 'মাটি' নামে যে গল্পটি তার অনূদিত হয়েছে তাতে সংকেতে চিত্রিত হয়েছে সে-সময়কার (১৯২৬-৭) সাম্যবাদী বাহিনী ও চিয়াংএর প্রতিবিপ্লবী বাহিনী, এই দুই বাহিনীর রূপ এবং একটি গ্রামের উপর তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ।

॥৪॥ **সুন্ সি-চেন** (১৯০৬—): লু সুন্-এর মতই চেকিয়াং-এর শাও শিঙ সহরে তাঁর জন্ম। পল্লী-চিত্রের জন্য তাঁর নাম ; গল্প, উপন্যাস, সাহিত্যিক প্রবন্ধ তিনি বহু লিখেছেন—বিদ্রূপ ও সামাজিক-বোধ দু-ই তাঁর লেখায় প্রচুর। ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাসে চিয়াংএর 'চিন্তা-সংস্কার'-এর উদ্যোক্তা 'নীল-কোর্তারা' প্রায় ২০০ শ' লেখককে নিকাশ করে—সুন্ও তখন গ্রেফ্তার হন। অনূদিত গল্পটির ইংরেজিতে নাম ছিল 'আ আও'।

॥৫॥ **তি য়েন চ্যান** (১৯০৮—) ; তাঁর স্ত্রী সিয়াও হুং সম্ভবত এখনকার চীনের প্রধানা লেখিকা। তি য়েন্ চ্যান গণ-সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রথম প্রধান লেখক ; গেরিলা বাহিনীর সৈনিক। তাঁর 'ভিলেজ্ ইন্ অগাস্ট-'এর বাঙলায় 'প্রবাহ' নামে অনুবাদ করেছেন অশোক গুহ। গোর্কি, শেখভ্ তাঁর আদর্শ। 'দাইরেন্ মারু জাহাজে' নামে তাঁর এ গল্পটি (ভ্রমক্রমে সুন সি-চেন-এর বলে এখানে মুদ্রিত হয়েছে) সত্য ঘটনা মূলক।

॥৬॥ **চুন-চান ইয়ে**—তরুণ লেখক। যুদ্ধারম্ভে ছিলেন তোকিওতে ; সেখানে জাপানীদের হাতে মার খান। পরে চীনে ফিরে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন ; চীনা যুদ্ধ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তখনি তাঁর লেখা ইংরেজিতে অনূদিত হচ্ছে। ১৯৪৫-এ তিনি যখন কেম্ব্রিজে ইংরেজি সাহিত্যের গবেষণা করছেন তখন এ গল্পটি তাঁর প্রকাশিত হয় পেঙ্গুইনের 'নিউ রাইটিঙ্'—২৬শ সংখ্যায়।

স্বপ্ন

পাহাড়ে বড় গরম, এত গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম। আর এরই মধ্যে সারা দিন ধরে হেঁটে বেড়িয়েছি। ঘামে চব্‌চব্‌ করছে, পা দুটোয় ফোস্কা পড়ে গেছে। এমনি করে চলতে চলতে অবশেষে একটা ছোট্ট উৎরাই-এ এসে পৌছলাম, এবং উৎরাই বেয়ে নীচে নামতেই তুঙ্‌তিঙ্‌ হ্রদ দেখতে পেলাম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ঝিরঝির করে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এখানে কেউ আশ্রয় নেয় নি, রাস্তায় গাড়িঘোড়া বা লোকজনেরও ভিড় নেই এবং জাপানী বিমানও উড়ছে না। লড়াইয়ের হাঙ্গামা শেষ পর্যন্ত পিছনে ফেলে এসেছি।

একটা নিঃশ্বাস—সত্যিকারের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলালাম। এমন সময় হ্রদের অপর তীর থেকে নীরবতা ভঙ্গ করে ঘেউ ঘেউ শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার হ্রদের চারদিক শান্ত নীরবতায় ভরে গেল।

পিঠ থেকে ময়লা কাপড়ের গাঁটরিটা নামিয়ে তারই উপর মাথা রেখে ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আকাশের রংটাও যেমন নীল, নীচে জলের রংটাও তেমনি নীল ; সেই নীলাভ আকাশ ও জলের উপর দেখতে দেখতে লজ্জার রক্তিম আভার মত অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ল। একদল হাঁস করুণা কলকণ্ঠে ঘরে ফিরল। সূর্য তখন অস্ত গেছে।

এক মুহূর্তের জন্যে চারিদিকে নিস্তব্ধ হল, এমন কি, একটি ঝি ঝি পোকার শব্দও শোনা যায় না, অথচ আসবার সময় পথে ঝিঁঝির ডাক অনেক শুনেছি। তরেপর ধীরে ধীরে কানে এল জলোচ্ছ্বাসের অস্পষ্ট একটা শব্দ—যেন বহু দূরে কোথাও ঢেউয়ের তুফান উঠেছে। প্রথমে শব্দটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যেন সেটা ঘণ্টাধ্বনির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা বাতাসের ঝাপটায় চার দিক প্লাবিত করে যেন সে শব্দ ভেসে এলো। এবার আর আমার বুঝতে বাকী রইলো না সেটা কিসের শব্দ। আমারই পরিচিত গান, সে গান আমি মধ্যচীনের মেয়েদের গাইতে শুনেছি বিস্তীর্ণ চরটভূমিতে। তখন আমি ছিলাম রাখাল বালক। ওই গান শুনলেই আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত :

ওই আকাশের প্রান্তদেশে
যাবো তোমার সাথে ;
সঙ্গে যাবো মহাসাগর পারে !
সাগর হয় তো শুকিয়ে যাবে,

চূর্ণ হবে অটল গিরিশ্রেণী ;
হৃদয় আমার এমনি রবে,
এমনি রবে হায় !
এপার ওপার যেখানে যাই
শেষ যেন তার নাই।

এই নির্জন স্থানে এই গান শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই কথা ভেবে আমি আরও বিস্মিত হলাম যে, তা হলে নিশ্চয়ই এর কাছাকাছি কোথাও মানুষের বাস আছে—যেখানে কেউ গাইছে এই সহজ সরল গান। মানুষ ? কথাটা ভাবতেই আমার মনে হল—যদি কিছু খাবার পেতাম ! যতই একথা মনে ভাবি ততই অনুভব করি যে, আমি ক্ষুধার্ত, সারাদিন কিছু খাইনি। আমার যেন বেশ মনে হচ্ছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি উপবাস করেই কাটিয়ে এসেছি। বেওকুফের মত ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে কি হবে ! আকাশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম এবং গান লক্ষ করে এগিয়ে চললাম।

হ্রদের ঠিক ডান দিকে একসারি গাছের পিছনে একখানি গ্রাম দেখতে পেলাম। গ্রাম্য ময়দানে একটা জনতা মিলেছিল, তখন তারা সকলে একে একে চলে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে তরুণ চাষী মজুর, ছিন্নবাস শিশুর দল আর লম্বা নলে ধূমপান রত বুড়োর দল। আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই তারা যে যার চলে যাচ্ছিল। কারুর মুখে বিষাদ কালিমা, আবার কেউ কেউ বা নর্তকীদের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নর্তকীরা যেন হতাশ ভাবেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন সরল মেয়ের চোখের পাতা তখনও সজল ছিল। গানটি যে তাদের কোমল প্রাণকে অভিভূত করে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমি জানতাম যে, গানটি বড় করুণ, কারণ এর পিছনে যে কাহিনীটি আছে সেটি বড় মর্মান্তিক, বড় করুণ। কায়ক্লেশে পিঠে বোচকাটা নিয়ে যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন জনতা আর সেখানে ছিল না। তারা সকলেই খাবার জন্যে যে-যার বাড়ী চলে গেছে। মনে হল, এরা লড়াইয়ের কোন খবরই হয় তো রাখে না! ওদের ভাগ্য ভালো। এবং আমার মনটা যে কেন খারাপ হয়ে গেল, তার কারণও আমি জানতে পারলাম না।

আমি গিয়ে এক বুড়োর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। লোকটি ভবঘুরে, তার মুখে চোখে একটা নির্বোধের মত চাউনি। তার পাশেই দাঁড়িয়ে দুটি তরুণী; নর্তকী; তাদের একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখতে বেশ সুশ্রী, যেন একটি ফুটন্ত পদ্ম। অপর মেয়েটি তখন হতাশ ভাবে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটি দেখতে কৃশ, যেন ক্রন্দনরত উইলো গাছের একখানি ডাল। আমরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, কারুর মুখে কোন কথা নেই। ক্রমে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে এল, সেদিকেই আমাদের একাগ্র লক্ষ্য। দেখতে দেখতে আমাদের চার পাশ অন্ধকারে ডুবে গেল।

অবশেষে বুড়ো নীরবতা ভেঙে আমাদের লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'তুমিও কি আমাদের মতই হা-ঘরে ?'

'হাঁ,' জবাবে বললাম, 'জাপানীদের অগ্রগতির মুখ থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। সেদিন তারা মধ্য চীনের উচ্যাং অধিকার করেছে।'

'বেশ, তা হলে তো ভালই হল, আমরা সবাই দুর্দিনের সাথী। এখন কথা হচ্ছে, রাতটা কাটাবার মত একটা আশ্রয় তো খুঁজে নেওয়া দরকার।'

এই বলে সে আগে আগে চলতে লাগল। আমি যেন সম্মোহিত

হয়ে তার অনুসরণ করলাম, আমার পিছনে আসছিল মেয়ে দুটি। আমার অবস্থাটা যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর সেটাও আমার মনে হল সঙ্গে সঙ্গেই। সত্যি বলতে কি, অচেনা মেয়েদের সামনে আমি প্রথমটায় ভারী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, বিশেষত কোন মেয়ে যদি আমার পিছন থেকে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করবার সুযোগ পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৃদ্ধ আপন মনেই চলতে শুরু করে দিল। তার সামনের দিককার দাঁতগুলি সবই পড়ে গেছে, তাই, তার কথাগুলি স্পষ্ট বোঝা যায় না। সে বললে ঃ

'ওহে ছোকরা, বুঝতেই তো পারছ, আমি একজন গাইয়ে।'

'আজ্ঞে হাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' তার গলায় চামড়ার বক্‌লেশে ঝুলানো জরা-জীর্ণ জয়ঢাকটার দিকে চেয়ে জবাবে বললাম। তার চলার ছন্দে ঢাকটাও বেশ তালে তালে দুলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনেশুনেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা খুড়ো, আপনি সাধারণত কি যন্ত্র বাজান?'

'কেন, জয়ঢাক। দেখো নি তুমি?' তার কথায় এটাই প্রকাশ পেল যে, সেটা যে আমার জানা আছে তাতে তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। একটুক্ষণ বাদেই সে যেন আশ্বস্ত করবার জন্যেই আমাকে আবার বললে ঃ 'আমিই দলের অধিকারী, বুঝেছ?'

'দল, কিসের দল?' আমি সত্যিই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

'কেন, নাচ-গানের দল! তোমার পিছনে যে মেয়ে দুটি আসছে, দেখেছ তো? অবিশ্যি তারা আমারই মেয়ে, তবে তারাই আমার দলের শিল্পী। প্রথম শ্রেণীর নর্তকী, বুঝলে, একেবারে প্রথম শ্রেণীর!'

এমনি ধারা আলাপ করতে করতে এক সময় আমরা একটা পাহাড়ের

গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটা নির্জন। সেখানে একটা অতি প্রাচীন মন্দির আছে।

'বুঝলে বাপু, এখানটায়ই আমাদের আজ থাকতে হবে,' সে বলল।

ভিতরে গেলাম। মন্দিরটা যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি নির্জন। দিয়াশলাইর সাহায্যে প্রদীপ জ্বালালাম। অথচ একটা ইঁদুরও ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করলে না, দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কি করব, ঠিক করতে না পেরে আমি বোকার মত অতি পুরাতন সেই প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোর সামনে অস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পিঠের বোচকাটা দোলাতে লাগলাম।

'এইটি আমার বড়মেয়ে ভায়োলেট,' মোটাসোটা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বুড়ো আমাকে বললে। মেয়েটি আমার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'আর এটি ছোট মেয়ে—ওর নাম স্প্রিং।'

তারপর সে এক গাদা খড় বিছিয়ে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'যাক, আর একটা দিন তবু কাটল!'

আমার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় আমি মৃদু হাসলাম। তারাও আমায় দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। তাদের সে হাসিতে এমন একটা আত্মীয়তার আমেজ ছিল যে আমি তা বর্ণনা করতে পারি নে। তাদের সে হাসিতে ছিল একটা আগ্রহ। আমার দিকে তারা তাকিয়ে রইলো। তাদের সে দৃষ্টিতে দেখলাম একটা আন্তরিক বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ। একটা কথা আমার মনে হলো, বৃদ্ধকে বলে উঠলাম:

'খুড়ো, আমাকে তোমার দলে নেবে?'

'কেন—তোমাকে দেখে তো বেশ মনে হচ্ছে তুমি ছাত্র, লেখাপড়া জান,' বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বুড়ো জবাব

দিল। 'সত্যি বলতে কি, আমাদের কাজ বড় মেহনতের, বড় কঠিন।'

'কিছু আসে যায় না', জোরের সঙ্গেই বললাম। 'আমি দু-তারা 'এর্হু' বাজাতে জানি। তোমার কাজে আসতে পারে। অবশ্য এটা বলাই বাহুল্য যে, তুমি স্বয়ং একজন ওস্তাদ।' আমার শেষের দিককার কথাগুলো যে আমার মনের কথা নয়, শুধু মন-রাখার উদ্দেশ্যেই বলা, এটাও নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারিনে, তবু না-বলে পারলাম না। কথাটা আপনা থেকেই এসে গেল। সে যাই হোক, আমার মনে হল, আমার প্রশংসায় বুড়ো খুশিই হল। সে বলল, 'বেশ, তা হলে তাই হোক। তুমি নিজেই যখন চাইছ, তখন আর কি, আমাদের একজন হয়েই থাক। আর এটাও জানি যে, সব মানুষই ভাই-ভাই।'

অত্যন্ত খুশি হলাম। মেয়ে দুটি সম্পর্কে আমার যে সংকোচ ছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে গেল। উনুন ধরানো ও রান্নার আয়োজনে আমি সাহায্য করতে লেগে গেলাম। প্রথমে কাজ সম্বন্ধে এবং তারপর পরস্পরের জন্মস্থান সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলল। এই প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, ওরা মাঞ্চুরিয়া থেকে এসেছে, কিন্তু ওদের আদি নিবাস ছিল মধ্য চীন, সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়ায় এসে ওরা উপনিবেশ করে। তাই ওদের গান আমার অত পরিচিত। তা ছাড়া, এটাও আবিষ্কার করলাম যে, ভায়োলেটের কণ্ঠস্বর আমার ভাল লেগেছে, কেন না, তার স্বর যেমন হালকা, তেমনি মেয়েলী। স্প্রিং-এর চোখ দুটিও আমার বড় ভালো লাগে, সে দুটি যেমন ডাগর, তেমনি অশান্ত এবং কালো, একেবারে রাত্রির অন্ধকারের মত কালো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বৃদ্ধ খড়ের উপর শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল আর একটিও কথা না বলে। কিন্তু তার জিভটা তখনও

নড়ছে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। গভীর কৌতুকের সঙ্গে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে কখনও এরকম করতে দেখি নি।

'ওর দিকে অমন করে চেয়ে থেকো না!' ভায়োলেটের যে মেয়েলী কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছে সেই কণ্ঠস্বর তার কথায় ফুটে বেরুল। 'বরং চাঁদের দিকে দেখো, চাঁদের আলো আজ বড় মনোরম হয়েই দেখা দিয়েছে।'

মাথাটা একটু তুলে উঠোনে নজর দিতেই দেখলাম, নির্মেঘ আকাশ থেকে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্য চীনে জাপানী আক্রমণের পর থেকে এ কয় মাস চাঁদের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

'বাঃ, কি চমৎকার!' বলে উঠলাম। 'এমন সুন্দর জ্যোৎস্না বহুকাল দেখিনি। দারুচিনি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে দূরান্তরের অস্পষ্টতার মধ্যেও চাঁদের মা বুড়ীকে দেখতে পাচ্ছি।' আমার উচ্ছ্বাসটা এত জোরে প্রকাশ পেল যে, স্প্রিং রাগতস্বরেই আমাকে থামিয়ে দিল।

'চুপ!' উঠোনের এককোণে যে অতি পুরানো বট গাছটি আছে সেটার দিকে ইসারা করে ও আমাকে বললে। 'ওই দেখো, কি হচ্ছে!'

গাছটার দিকে তাকালাম—একটা বিকটাকার গাঁটওয়ালা প্রাচীন গাছ, এত গাঁট রয়েছে যে ওটার বয়স কম্‌সে-কম একশ বছর হবেই। এবং সেই সঙ্গে আরও দেখলাম যে, হেলে-পড়া গম্বুজের পালকের মত গোটাকয়েক পাতা নীচের দিকে ঝুলে আছে। উপরের দিকের ডালে পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দও শুনলাম।

'ও. তাই,' মনে মনে বললাম, ঘুমন্ত পাখী আমার কণ্ঠস্বরে ভয় পেয়ে গেছে, বেচারী।

'এ সম্পর্কে আমার একটা অনেক-শোনা চলতি কথা মনে পড়ল,'

স্প্রিং বলে চলল, তার স্বরে কোন উত্তেজনা নেই। 'যদি কেউ বার বার তিনবার কোন ঘুমন্ত পাখীর ডানার ঝাপটা শুনতে পায়, তা হলে সে একটি ভাল স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন নাকি সফলও হয়।'

ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, তা হলে তুমি ক'বার তা শুনেছ?'

'ঠিক, তিন বার।'

'তা হলে তো ভালই হল, ভাল স্বপ্ন দেখবে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি নে,' স্প্রিং ঠোঁট বাঁকিয়ে ক্ষীণ স্বরে জবাব দিল। 'কবছর ধরে' তো কেবল দুঃস্বপ্নই দেখে আসছি।'

'এর মধ্যে কি একটিও ভাল স্বপ্ন দেখোনি? কি আশ্চর্য! আচ্ছা, কেন বল ত?'

বুঝতে পারলাম আমার স্বরে খানিকটা আকুলতা ফুটে উঠছে। অন্য লোকের স্বপ্ন সম্পর্কে আমি কেন অতটা আগ্রহ দেখাব—ভেবে পেলাম না এবং শুধু তাই নয়, এতটা অধীরতাও আমাকে মানায় না।

স্প্রিং কোন জবাব দিতে পারল না। সে শুধু তার চুলের মত কালো এক জোড়া চোখে বেরালের চোখের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল। হয় তো সে একটার সঙ্গে আর একটা জিনিস গুলিয়ে ফেলেছে। সেটা কি, তাও বুঝতে পারছে না। তার এই অপ্রতিভ অবস্থাটা আমাকেও এমন অপ্রতিভ করে তুলল যে, তার চোখ-ঝলসানো সরল চাউনির ভিতর আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বুদ্ধিমতী ভায়োলেট একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের নীরবতা ভেঙে দিল। সে বলল:

'তার কারণ, আমাদের জীবন অত্যন্ত অস্থির। চার বছর আগে জাপানীরা যখন আমাদের গ্রামটা পুড়িয়ে দেয় তখন থেকে আমরা

একদিনের জন্যেও স্বস্তি পাইনি। আমরা যেখানেই যাইনে কেন, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করে।'

'এখন কিন্তু আমরা দস্তুর মত স্বস্তিতেই আছি,' হঠাৎ স্প্রিং নীরবতা ভঙ্গ করল। মনে হল, হয় তো ওর মনে কোন নতুন ভাব জেগেছে। 'গত তিন দিন জাপানীদের কোন সাড়া শব্দই অবশ্য পাইনি। ...'

এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহই রয়েছে। তাই আপনমনেই মাথা নেড়ে গোপনে ভাবলাম, 'সবুর কর, দেখতে পাবে।' কিন্তু ওদের মনের প্রশান্তি নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না। তাই বললামঃ 'তা হলে তো তোমরা ভাল স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। আচ্ছা, তোমরা কেমনতর ভাল স্বপ্ন দেখতে পেলে খুশি হও? তোমরা কি যাদুকরের যাদুদণ্ড চাও—যা ছোঁয়ালেই যে-কোন জিনিসই সোনা হয়ে যায়? না, একজোড়া ডানা, যাতে ভর করে তোমরা সুখের দেশে পাড়ি জমাতে পার? কি চাও তোমরা?'

'আমরা যাযাবরের মেয়ে, আমাদের অতটা বড় আশা নেই,' স্প্রিং একটি মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথাটা বললে। 'আমি পড়াশুনা করতে চাই। লেখাপড়া শেখাই আমার ইচ্ছে। লেখাপড়া শিখতে পারলে গানের স্বরলিপি পড়তে পারব, নিজেও লিখতে পারব। ছেলে বেলায় মা যখন গান আবৃত্তি করতেন তখন থেকেই পড়াশুনা ভাল লাগত। মা বেশ ভাল নাচতে গাইতে পারতেন এবং বাবার চেয়েও ঢের বেশী উপার্জন করতেন।' হঠাৎ সে থেমে গেল। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন ও বাস্তবে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

ভায়োলেটও উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কেন যেন সে একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। সে যে গোপনে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, এটা আমার নজর এড়াল না। সে বলল, 'আমিও লেখাপড়াই শিখতে চাই।'

'তাই নাকি? সত্যি লেখাপড়া শিখতে চাও!' স্প্রিং তার আচ্ছন্ন ভাব থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। 'সেদিন যখন তুমি গ্রামের ময়দানে নাচ দেখাচ্ছিলে, তখন গ্রামের জমিদার সেখানে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তোমাদের নাচের তিনি বিশেষ তারিফ করেন, পরে বাবাকে বলেছিলেন, তিনি তোমাকে কন্যা হিসেবে দত্তক নিতে চান। তিনি তোমাকে স্কুলে দেবেন, ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। বিশেষত তার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়েও কেউ নেই। আসলে তুমি ভণ্ড, তখন কিন্তু বলেছিলে যে তুমি আর কিছু চাও না, বাবার দারিদ্র্যকেই গ্রহণ করবে।'

কথা শুনে ভায়োলেট যেমন ভড়কে গেল, তেমনি ঘাবড়ে গেল, কি বলা উচিত, ঠিক করতে পারল না। শুধু আম্‌তা আম্‌তা করল: 'সে বুড়ো শয়তান যা বলেছিল, কাজে সে তা করত না। অত বোকা নই, তার মতলব যেন বুঝিনে! আসলে তার মতলব ছিল অন্য রকম।'

'কে কোথায় আছ, রক্ষা করো, রক্ষা করো! ওই দেখো তারা আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে!' একটা বজ্রাঘাতের মত সে চীৎকার আমাদের কানে এসে পৌছল। তৎক্ষণাৎ আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। চীৎকারটা আসছিল আমাদের বুড়োর কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই খড়ের গাদায় নাক ডাকতে শুরু করল। আমার মনে হল, হয় তো একটা সাপ তার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছে, কেন না, এরকম নির্জন পরিত্যক্ত জায়গায় সাপ আসাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কাজেই একগাছি লাঠি জোগাড় করবার জন্যে আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভায়োলেট আমাকে বাধা দিল।

'ও কিছু না,' সে বললে। 'উনি স্বপ্ন দেখছেন। জাপানীরা যেদিন আমাদের গাঁয়ে ঢুকে আমার মাকে নিয়ে যায়, সেদিন থেকেই উনি

মাঝে মাঝে এরকম করেন। তারপর মায়ের কি হল, আমরা জানতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, মা মরে গেছে। ...'

সব বুঝতে পারলাম। কাহিনীটি বড় করুণ, কিন্তু বিস্তারিত জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম না, কেন না, তাতে ওদের মনে আরও আঘাত লাগতে পারে এবং আমারও মনে কম বেদনা লাগত না। আশ্চর্যের বিষয়, যুদ্ধের সময় লোকেরা যেন স্বভাবতই কেমন কোমল অন্তঃকরণ হয়ে পড়ে। তাই শুধু বললাম, 'যাক, এখন শুয়ে পড়া যাক। কাল থেকে তো আমার এই বাড়তি পেটটি ভরাবার জন্যে তোমাদের আরও খানিকটা বেশী মেহনত করতে হবে।' এবং শুভরাত্রি না জানিয়ে তাদের তরুণ মনে আশার ক্ষীণ আলো দেখাবার উদ্দেশ্যে শুধু বললাম: 'আমাদের দেশ থেকে যখন শত্রুরা সব চলে যাবে, দেশ যখন মুক্ত হবে, আমরা স্বাধীন হব তখন সকলের জন্যে আমরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করব। তখন প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখবে, গান স্বরলিপিও পড়তে পারবে।' এই বলেই আমি শয্যার আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন প্রাতে আমরা পাশের এক গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি 'এরহু' বাজালাম আর বুড়ো বাজালেন তার ঢাক। মনে হল, আমি ভালই বাজিয়েছি, তবে অনেক দিন এমনি ধারা বাজাইনি। আমাদের বাজনা ও স্প্রিং-এর গান মিলে ভায়োলেটের নাচে নিশ্চয়ই একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আগেই বলেছি যে, সে ছিল দস্তুর মত যাকে বলে মোটাসোটা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাজনার তালে তালে সে এমন স্বাভাবিক সুন্দর নেচেছিল যে, আমার মনে হল, ও যেন মৎস্যকন্যা, জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে সে গানও গাইছিল, তার কণ্ঠস্বর যেমন হালকা, তেমনি মেয়েলী। আমি নিজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আমার বিশ্বাস, তরুণ গ্রামবাসীদের অন্তরও তেমনি

বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তার রক্তিম ঠোঁটে এক একবার করে ছোট্ট একটি কৃত্রিম হাসি খেলে গেলেও তাতে যে একটি করুণ বিষণ্ণতার ছাপ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর সেই কারণেই তা দর্শকদেরও চিত্ত আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। কিন্তু তা হলেও দর্শকের সংখ্যা বেশী ছিল না।

পেশাদার বাজিয়ের মত গম্ভীরভাবে আমি যন্ত্রটি বাজিয়ে চলেছি, আর বেচারী ভায়োলেট সেই প্রায় জনহীন গ্রাম্য মাঠে দর্শকদের প্রশংসাবাদ না পেয়েও একা একা নেচে চলেছে—কথাটা মনে হতেই মনটা আমার বড় দমে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কেই আমার মনে একটা বেদনাবোধ ছিল। বুড়ো শেষের দিকে কয়েক মিনিট পাগলের মত ক্ষেপে গিয়ে ঢাক বাজিয়ে হঠাৎ ঢাকের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে একখানি পাথরের উপর বসে পড়ে শ্রান্ত কণ্ঠে ভায়োলেটকে বললে: 'মা, এবারে একটু জিরিয়ে নে বাছা।' ভায়োলেট এরপর সোজা গিয়ে বাবার পাশে বসে পড়ল। তখনও কিন্তু তার মুখে সেই ভঙ্গীহীন হাসি ও বিষাদক্লিষ্ট চাউনি ছিল।

একটু বাদেই আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আর একটি গাঁয়ে যাত্রা করলাম। তখন মধ্যাহ্ন হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় গিয়ে দেখতে পেলাম দলে দলে লোক চলেছে, তাদের মাথা নুয়ে পড়েছে, দোলনায় শিশু ও বোচকাগুলি পিঠে নিয়েছে, পিছন পিছন কুকুরগুলি জিভ বের করে চলেছে। তাদের কপাল সূর্যের তাপে পুড়ে যাচ্ছে, ঘাম চক্‌চক্ করছে এবং টপ্‌টপ্ করে তাদের তোবড়ানো গালে এসে পড়ছে। দেখেই বুঝতে পারলাম—ব্যাপারটা কি। কিন্তু তবু নিশ্চিত জানবার জন্যে এক বুড়োকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম:

'জাপানীরা পিছনেই আসছে,' সে বলল। 'আজকে সকালেই একটা

লোহার শকুন আমাদের গাঁয়ে ডিম ফেলেছে। ডিম ফুটে গিয়ে পঁচিশ জন মারা গেছে, তার মধ্যে ছ'জন শিশু আর তিনটে গরু।'

'নাঃ, এ পৃথিবীতে আর বাস করা চলল না!' বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল! 'চার বছর ধরেই এই বীভৎসতাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছি নে।' তারপর সে মেয়েদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তোদের নিয়ে এখন আমি কি করি বল্ ত মা? আমি ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়ছি, আর তোরাও ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিস। ...'

মেয়ে দুটি জবাব দিল না। তারা দুজনেই মাথা নীচু করে রইল, আর আমরা কায়ক্লেশে হেঁটে চললাম। আর একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামখানি খালি। এমনি করে তৃতীয় গ্রামে গেলাম, সেখানেও লোকজন কেউ নেই। আমাদের কারুরই কিছু খাওয়া হয়নি, রোজগারপাতিও কিছু হয় নি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও শ্রান্তিতে আমরা আর চলতে পারছিলাম না।

'বরং কাল যে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানেই ফিরে যাই, কি বল?' বুড়ো শেষটায় বলে উঠল। 'খামকা পথ চলে কোন ফয়দা নেই। তা ছাড়া, আমি আর চলতে পারছি নে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার পিছন পিছন চললাম। মন্দিরে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন আর আমাদের দাঁড়াবার শক্তি রইল না। মেয়ে দুটি খড়ের গাদার উপর বসে পড়ল, তাদের পাশেই দেয়াল ঠেসান দিয়ে আমি বসলাম আর বুড়ো বসল আমাদের সামনে। আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের জিভ নেই। কিন্তু সেই মেয়ে দুটির নিরীহ চোখে একটা অসহায়, নির্বোধ, এবং সেই সঙ্গে এমনি একটা বিষণ্ণতার ছাপ আমার নজরে পড়ল—যা সকল

ভাষাকে হার মানায়। তাদের দৃষ্টি বৃদ্ধের দিকে নিবদ্ধ, আর বৃদ্ধ তখন পাগলের মত নিজের টাক পড়া মাথাটা জোরে জোরে চুলকোচ্ছে, তার সর্বাঙ্গ ঘামে সপসপে হয়ে গেছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল:

'কিছু তো খেতেই হবে। দেখি জমিদার মশায়ের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করতে পারি কি না।' এই বলেই সে ভায়োলেটের দিকে তাকাল। 'লোকটা বদমাস নয় বলেই মনে হচ্ছে। সে যখন তোকে দত্তক নিতে চাইছে, তখন তার যে অন্য কোন মতলব আছে তা কিন্তু আমার মনে হয় না।'

এই বলেই সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। সত্যি সে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাই এ বয়সে তার পক্ষে ওরকম ছুটে যাওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু সে না গেলে আর কে যাবে? এই প্রথম আমারও মনে হল, আমরা কত অসহায়!

ঘণ্টা দুই বাদে সে একটা থলেয় করে কিছুটা চাল নিয়ে ফিরে এল। আমরা সকলেই খুশি হয়ে উঠলাম। আমি ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে থলেটা নিলাম, সেটা তখন আমাদের কাছে সোনার মত। স্প্রিং তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে খড়ের গাদায় বসিয়ে দিল, ভায়োলেট আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল। শরৎ কালে বিল থেকে যেমন কুয়াসার মেঘ ওঠে, তেমনি ওর কপাল থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কিন্তু বুড়ো সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল:

'তোরা সব বস দিকি।' তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভায়োলেটকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল: 'ভায়োলেট, তোমার ব্যবস্থা করে এলাম। ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়, খুব তাড়াহুড়ায় হয়ে গেল বটে, তবে তার জন্যে অবশ্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'কি বলতে চাও বাবা?' ভায়োলেটের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'যে জমিদার মশায় চাল দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—তিনি কে, তোমরা জান। তোমাকে তার বড় পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন তোমাকে দত্তক নিতে পারবেন না, কেন না, এখন কোন স্কুল নেই, পড়াশুনার সুবিধাও নেই। কাজেই তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন। তবে কথা দিয়েছেন, তোমাকে সুখে রাখবেন।'

'তুমি কি তাঁকে কথা দিয়েছ?' ভায়োলেট জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বরেও চোখ দুটির মতই একটা দুরন্তভাবের আমেজ।

'নিশ্চয়ই!'

'বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকব!'

'দুর বোকা মেয়ে!' বাপ জবাবে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। কিন্তু ক্রমে সে শান্ত হয়ে এল, বলতে লাগল, 'আমি জানি, তোমার পক্ষে সে একটু বেশী বয়সের, কিন্তু মা, আমার কাছে এমনি ধারা বেঁচে থাকার কথাটাও তো ভাবতে হবে। তোর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমিও বড় তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়ছি। জীবনে আর অবস্থার উন্নতি করতে পারব না। সে ধনবান। তার কাছ থেকে তোকে কোন বিষয়েই এতটুকুও ভাবতে হবে না। তোর ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শিখবে, শিক্ষিত হবে। আমি তোর কি হাল করেছি ভেবে দ্যাখ্ ঃ ভবঘুরের মেয়ের মতই তোকে তৈরি করেছি। ...'

তার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একসময়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

ভায়োলেট মমির মতই নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে অস্পষ্ট একটা কোলাহল শোনা গেল। বৃদ্ধ পিতা মাথা তুলে ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল, 'জমিদার মশায় তোকে নেওয়ার জন্যে

লোক পাঠিয়েছেন। বুঝলে মা, শত্রুরা ক্রমেই কাছাকাছি এসে পড়ছে। আর দেরী করা চলে না। জমিদার শিগ্‌গির নিরাপদ কোন জেলায় সরে যাবেন। বোকামি করো না। যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

ইতিমধ্যে একখানা পালকী এসে দরজার সামনে উপস্থিত হল। পালকীখানা লাল রং-এর, তাতে কারুকার্যখচিত ঝালর ঝুলছে। তবে বিয়ের কনের যাওয়ার জন্যে যে পালকী ব্যবহৃত হয় এখানা সে পালকী নয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্যে কেউ বিয়ের পালকী পাঠায় না। ষণ্ডা প্রকৃতির একজন যুবক আর দু'জন পালকী বেয়ারা পালকীর সঙ্গে এসেছে, লোকটা জমিদারের গোমস্তা। পালকী বেহারারাও বেশ জোয়ান লোক, কোমর পর্যন্ত তারা উলঙ্গ, বাহুতে কঠিন মাংসপেশী। তাদের দেখে মনে হয় যেন তারা কাউকে গায়ের জোরে অপহরণ করতে এসেছে।

বৃদ্ধ নড়ল না, এমন কি, ষণ্ডাগোছের গোমস্তাটাকে নমস্কার পর্যন্ত করল না। বাক্যহীন বোকার মত সে বসে রইল। হঠাৎ সে বলতে শুরু করলঃ 'সত্যি ভায়োলেট, আমার প্রতি যদি তোমার এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকে, তা হলে আমার কথা শোন। পালকীতে উঠে বসো। আমি তোমার বাপ, তোমাকে জন্মাতে দেখলাম, তোমাকে এত বড়টি হতে দেখলাম। তোমাদের সুখ শান্তি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। সুসন্তানের মা হও—এই কামনাই আমার রইল।'

ভায়োলেটের মুখে রা নেই। সম্মোহিতের মত সে ধীরে ধীরে গিয়ে পালকীতে উঠে বসল। ষণ্ডাগোছের গোমস্তাটা তাড়াতাড়ি পালকীর দরজা বন্ধ করে দিল। বেহারারা অতি সহজে সাধারণ মালের মতই পালকীটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল

২

বটে কিন্তু পশ্চিমাকাশে একটি অসম্পূর্ণ মনোজ্ঞ রামধনু দেখা দিল। কোথাও ঝড় হয়েছে নিশ্চয়, কেন না, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ায় বটপাতাগুলির খস্‌খসানি শুরু হয়েছে, তারা যেন গাইছে এবং একই সঙ্গে নালিশও করছে।

হঠাৎ একটা আর্ত কান্না গুমরে উঠল। কোন হতভাগিনী মা সন্তানের শোকে গলি পথে যেন ডুকরে কেঁদে উঠে বাতাসকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কান্নার গভীরতা থেকেই বুঝতে পারলাম—এ কান্না ভায়োলেটের। কিন্তু অবিলম্বেই সে কান্না অস্পষ্ট হয়ে হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর আবার সেই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা, চারিদিকের সূচীভেদ্য অন্ধকার, রামধনুর শেষ ফিলানটি কিন্তু তখনও জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

আমার মনটা এমন ভারী হয়ে রয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন কোন গুরুভার চেপে বসেছে। আমি এক রকম চেঁচিয়ে উঠলাম: এই আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি; এই আমাদের জীবন! মনে হল, এর থেকে এখন আর আমাদের পরিত্রাণ নেই। কোথাও গিয়ে কেউ আশ্রয় নিতে পারে না। এই দেশেই আমি জন্মেছি, এখানেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কাজেই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমি বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেলাম, সে তখনও চোখ দুটি বুজেই রয়েছে।

বললাম, 'কর্তা, ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্যে মার্জনা করো। শত্রুদের সঙ্গে লড়বার জন্যে আমি গ্যেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে চাই। তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এর জন্যে আমি দুঃখিত।'

বুড়ো চোখ মেলে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাল, তার পর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'বেশ। আজকের পৃথিবীটা তোমাদেরই। কিন্তু সারাদিন তো কিছু খাওয়া হয়নি, রাতে খাওয়া দাওয়া কর, কাল সকালে যেয়ো।' তারপর আবার চোখ বুজল। সে কিছু খেতে রাজী হল না।

একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। কাজেই স্প্রিং-এর দিকে নজর দিলাম। সে তখন বেদীর সামনে খড়ের উপর একা বসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, ও নিশ্চয়ই দিদির জন্যে গোপনে চোখের জল ফেলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ও কাঁদেনি। ও তখন রামধনুর শেষ খিলানটি ও বটপাতার খসখসানির দিকে লক্ষ্য রেখে আপন মনেই ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছেঃ 'আশ্চর্য, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম না! অথচ পাখীটার ডানা ঝাপটার শব্দ তিন তিন বার স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম। ...'

'এ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়,' আমি মন্তব্য করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠল।

'না, না, তা নয়। আমার মা বিশ্বাস করতেন কি না,' ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল। আমার উপস্থিতিতে ও যেন আঁতকে উঠল। 'আচ্ছা, তুমি কি সত্যি লেখাপড়া কর?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, তা হলে তো ভালই হল। আমাকে বর্ণ-পরিচয়টা শিখিয়ে দাও না।' ওর সুরে অনুনয়। সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে ওর পাশে বসিয়ে দিল। 'আর এখন আমাদের নষ্ট করবার মত সময় নেই। বর্ণপরিচয়টা আমাকে এখুনি শিখিয়ে দাও। আর সময় নষ্ট করতে পারিনে।'

একটা কাঠি দিয়ে বালির উপরে গোটা কয়েক অক্ষর বড় বড় করে লিখলাম। প্রথমটা রামধনু (হুঙ্)। এ অক্ষরটার দু-অংশ, আমি ওকে বুঝিয়ে বলতে লাগলাম, 'বাঁ দিকের অংশটার মানে কীট, আর ডান দিকেরটার মানে শিল্প। কাজেই রামধনু হচ্ছে একটা শৈল্পিক কীট।'

'আমাদের ভাষাটা কেমন কবিত্বময়।' আনন্দে ও হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত আর চোখ দুটো হয়ে উঠল উজ্জ্বল। 'আমি যদি লিখতে পড়তে জানতাম! কবে যে জানব, ভগবান জানেন! মায়ের গানগুলিই আগে লিখতে পড়তে শিখব। ...'

'দূর্ বোকা!' চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার মনে হল, সমস্ত অবস্থাটা কি রকম হাস্যকর। ও যেন আমাদের ভাষার কবিত্বগুণ ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছে, সব কিছুই, এমন কি, ওর দিদির ভাগ্যবিপর্যয় পর্যন্ত ওর মনে নেই। এতে আমার মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। আমাদের বর্ণমালার গড়ন সম্পর্কে আলোচনা করবার আগ্রহটাও আমার আর রইল না। অবসাদের ভান করে আমি শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। ভায়োলেটের কথা ভাবতে লাগলাম, তার সেই হালকা মেয়েলী কণ্ঠস্বর, তার রক্তিম ওষ্ঠপুট এবং বিষাদ মাখা হাসি—সব কিছু মনে পড়ল। তার হাসি সময় সময় আমার অন্তরটা মুচড়ে দিত।

পরদিন প্রাতে আমিই সর্বাগ্রে ঘুম থেকে উঠলাম। আমাদের দলের অধিকারী ও স্পিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করব ঠিক করলাম। কিন্তু বুড়ো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার ভান করে ছিল, কেন না, তার চোখের পাতা মাঝে মাঝে মিট মিট করছিল। সে হয় তো গোপনে কাঁদছে, তাই আমি মুখ খুলতে সাহস পেলাম না। আর স্প্রিংও তখন পাথরের মত অনড় হয়ে আছে। কাজেই তাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যেই আমি পা বাড়াচ্ছিলাম ঠিক তখনই মেয়েটি হঠাৎ চোখ মেলল, তার সে দৃষ্টি যেমন উদাসীন তেমনি করুণ, অশ্রুসজল; দিনের আলোয় চক্ চক্ করছে।

'তা হলে তুমি চললে ?' ও জিজ্ঞাসা করল। 'জান, কাল রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি !'

'ভাল স্বপ্ন, নিশ্চয়ই ?' আমার কণ্ঠস্বরে একটা বিষণ্ণতার আমেজ।

'হাঁ, ভাল স্বপ্ন,' তার মুখে জোর-করে-আনা একটি করুণ হাসি ফুটে উঠল। 'স্বপ্নে দেখলাম, দিদির বিয়ে হয়েছে একটি প্রিয়দর্শন ছাত্রের সঙ্গে। দিদি এখন লেখাপড়া শিখছে, গানের স্বরলিপি পড়তে, লিখতে শিখেছে। ...'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাই যেন হয়।' কিন্তু কি একটা অজানা শক্তি যেন আমার জিভটাকে চেপে রাখল। বোকার মত মেয়েটির সুমুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তা হলে বিদায়,' মেয়েটিই অবশেষে আমাকে বলল। কিন্তু তার চোখ দুটি ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠল, ও কি যেন বলতে চায়। অথচ আমি বুঝতে পারছিনে।

ওদের ছেড়ে আমি চলে এলাম। অনেক দিন আমি ওর সে দৃষ্টির মানে বার করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। কিন্তু এখন যেন বুঝতে পারছি বলে মনে হয়।

ওষুধ

শরৎ কাল। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। চাঁদ ডুবে গেছে। বিস্তীর্ণ নীল আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি তখনও ঘুমিয়ে আছে, শুধু যারা নিশাচর তাদেরই চোখে ঘুম নেই, আর ঘুম নেই হুয়া লাও-শুয়ানের চোখে। সে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে। বিছানা থেকে ঝুঁকে পড়ে দিয়াশলাই জেলে বাতিটা ধরায়। প্রদীপের ফিকে সবুজ শিখাটি কাঁপে, এবং সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় চায়ের দোকানের দুটি ঘর।

"সিয়াও-শুয়ানের বাপ, যাচ্ছ?" নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হয়। পিছনের

ছোট ঘরখানি থেকে অবিশ্রান্ত কাশির শব্দ শোনা যায়—খক্ খক্।

লাও-শুয়ান এক মুহূর্ত কান পেতে শোনে, তারপর পোশাকটি এঁটে মহিলাটির দিকে হাত বাড়ায়—

"ওটা দাও তো !"

হুয়া তা-মা বালিসের নীচে হাতড়ে একটি ছোট টাকার থলে বার করে লোকটির হাতে তুলে দিল। দুর্বল হাতে থলেটি পকেটে রেখে হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে দু-বার বাজিয়ে দেখল, ঠিক আছে কি না। তারপর একটি কাগজের লণ্ঠন জ্বেলে তেলের প্রদীপটি নিবিয়ে দিল। লণ্ঠনটি হাতে করে নিয়ে একবার সে ভেতরের ছোট ঘরটিতে গেল। ... গলাটা ঘড়্ ঘড়্ করে, তারপর আবার প্রচণ্ড কাশি আরম্ভ হয়। কাশির বেগটা যখন কমে এল, তখন লাও-শুয়ান চাপা গলায় ডাকলে, "সিয়াও-শুয়ান! ... না—না উঠবার চেষ্টা করো না। ... দোকান তোমার মা দেখবে।"

ছেলে কোন উত্তর দিল না। তার ঘুমের যাতে বিঘ্ন না হয় এই ভেবে লাও-শুয়ান খিড়কি দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারে ধূসর রং-এর পথটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। লণ্ঠনের আলোতে শুধু নিজের পা দুটো দেখা যায়ঃ সমান তালে একটির পর একটি পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর দেখা যায়; তারা পাশ কাটিয়ে চলে, ঘেউ ঘেউ করে না। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস লাও-শুয়ানের বেশ ভাল লাগে। মনে হয়, এ বাতাসের স্পর্শে যেন তার যৌবন ফিরে আসছে। মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার একটা অদ্ভুত যাদুশক্তি যেন এর আছে। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে

চলতে লাগল। ধীরে ধীরে আকাশ ফরসা হয়ে আসে, এবার পথটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

নিবিষ্টমনে পথ চলতে চলতে হঠাৎ লাও-শুয়ান চমকে উঠল একটা চৌমাথার মোড়ে এসে। সে থেমে যায়, তারপর কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটি দোকানের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার হাড়গুলো কন্ কন্ করে উঠল।

"ওঃ, এ যে এক বৃদ্ধ!"

"তেজ আছে, এত সকালে বিছানা ছেড়েছে!"

লাও-শুয়ান চোখ মেলে দেখে, সামনে দিয়ে অনেকগুলি লোক কোথায় চলেছে। তাদের ভিতর থেকে একজন পিছন ফিরে ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়। চেহারা দেখে ঠিক ওকে চিনে উঠতে পারে না। চোখ দুটি উজ্জ্বল, ঝক্ ঝক্ করে, কিন্তু প্রাণহীন; দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দৃষ্টি যেন হঠাৎ একটা শিকার খুঁজে পেয়েছে। লাও-শুয়ান দেখল, তার লণ্ঠনটা নিবে গেছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখে, টাকাগুলি ঠিক আছে। তারপর আবার চলতে শুরু করে। দু-পাশে অসংখ্য অচেনা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভোরের সেই স্বল্প আলোতে যেন ভূতের মত অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তারা চেয়ে আছে। ও স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে। আস্তে আস্তে মনে হয়, তারা যেন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

জনতার মধ্যে যে কয়েকজন সৈনিক আছে সেটা বুঝতে ওর দেরি হয় না। তাদের কোটের সামনে ও পিছনে বড় বড় সাদা কাপড়ের বর্তুল আঁকা। সেগুলি রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন, দূর থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। দু-একজন ওর দিকে এগিয়ে আসতেই পোশাকের রং দেখে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হয়। বহু লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়,

তারপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ছোট ছোট দল এক সঙ্গে মিশে সমুদ্রস্রোতের মত দ্রুতপদে এগিয়ে চলে। মোড়ের কাছে এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। লাও-শুয়ানের দিকে পিছন করে তারা অর্ধ-চক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

সকলে মিলে হাঁসের মত গলা বাড়িয়ে কিসের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে রইল ; যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের হঠাৎ নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই জনশ্রেণীর অন্তরাল থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন লাও-শুয়ানের কানে আসে। দর্শকদের ভিতর একটা চাপা কান্নার প্রবাহ বয়ে যায়। হঠাৎ একটা চঞ্চলতার সঙ্গে তারা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। লোকগুলো ক্ষিপ্রগতিতে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসে, কেউ কেউ বা একেবারে এসে পড়ে লাও-শুয়ানের গায়ের উপর, মনে হয়, যেন তাদের ধাক্কায় ও মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

"হেই ! এক হাতে টাকা, আর এক হাতে জিনিস !"

মিশমিশে কালো পোশাক পরা একটা লোক লাও-শুয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো ইস্পাতের মত ঝক্ ঝক্ করে, দেখে মনে হয় যেন দু-খানা শান দেওয়া তলোয়ার। সে দৃষ্টি লাও-শুয়ানের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়, ভয়ে তার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আসে। কালো পোশাক পরা সেই লোকটি তার মস্ত বড় একখানি খালি হাত লাও-শুয়ানের দিকে বাড়িয়ে দেয়, অন্য হাতে একখানি ছোট্ট রুটি। সেই রুটি থেকে তাজা লাল পদার্থ টপ্ টপ্ করে মাটিতে ঝরে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি লাও-শুয়ান পকেট হাতড়ে দেখল। টাকাগুলি বের করে তুলে দেবার চেষ্টা করল সেই কালো-পোশাক-পরা লোকটিকে—যার হাত থেকে লাল রঙের তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছিল।

কিন্তু কি জানি কেন, সেই জিনিসটা হাত পেতে নেবার সাহস ওর হচ্ছিল না।

"ভয় কিসের? নিচ্ছ না কেন?" লোকটি ব্যস্ততার সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল। লাও-শুয়ান তবুও ইতস্তত করে। লোকটি এবার তার হাতের লণ্ঠনটা কেড়ে নিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে তাই দিয়ে খাদ্য-পিণ্ডটা জড়িয়ে লাও-শুয়ানের হাতে গুঁজে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে তার কাছ থেকে টাকাগুলি মুঠো করে তুলে নিলে। "বুড়ো ভেড়া কোথাকার!" বলে বিড় বিড় করতে করতে লোকটা অন্য দিকে ফিরল।

কে যেন লাও-শুয়ানকে জিজ্ঞাসা করে, "কার অসুখ?" লাও-শুয়ান কোন উত্তর দেয় না, নিবিষ্ট মনে কাগজের সেই মোড়কটির দিকে চেয়ে থাকে। দশ পুরুষের বংশে একটি মাত্র সন্তান পেয়ে তারা যে নিবিড় ঐকান্তিকতার সঙ্গে সেই শিশুকে বুকে তুলে নেয়, এই জিনিসটি হাতে পেয়ে লাও-শুয়ানের মনেও সেই অনুভূতিই জেগে উঠল। পৃথিবীর আর কোন কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। যে-বস্তু সে হাতে পেয়েছে তাই দিয়ে সে নিজের ঘরেই এবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে একটি বলবান মানুষ। ওর আশা হয়, এই থেকে আসবে ওর জীবনে প্রভূত সুখ শান্তি।

২

সূর্য উঠেছে। সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ, ওর চায়ের দোকান পর্যন্ত চলে গেছে। পিছনে চৌরাস্তার মোড়ে দিনের আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একখানি জীর্ণ লিপি-ফলক, তাতে অস্পষ্ট সোনালী অক্ষরে খোদাই করা আছে 'প্রাচীন মণ্ডপ—'

লাও-শুয়ান বাড়ী পৌঁছে দেখল চায়ের ঘরখানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে, টেবিলের সারিও ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে, কিন্তু তখনও খদ্দেরদের চা দেওয়া শুরু হয় নি। কেবল মাত্র সিয়াও-শুয়ান দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে একটি টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছে। তার কপাল থেকে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে, গায়ের ছোট্ট সঞ্জাব দেওয়া কোটটি দেহের সঙ্গে এঁটে আছে। কোটের তলা থেকে কাঁধের হাড়টা এমন উঁচু হয়ে উঠেছে যে, পিঠে যেন 'বাঃ' অক্ষরটা দাগ কেটে বসেছে। এ দেখে লাও-শুয়ান ভুরু কোঁচকায়। তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তার মুখ খোলা, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। "তে-লিয়াঙ-মাঃ? পেলে?" সে জিজ্ঞাসা করে।

"হাঁ, পেয়েছি।"

উভয়েই তখন কিছুক্ষণের জন্যে রান্না ঘরে চলে যায়, সেখানে গিয়ে তারা কি পরামর্শ করে। তারপর হুয়া তা-মা তাড়াতাড়ি এসে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যেই একটি শুকনো পদ্মপাতা নিয়ে এসে টেবিলের উপর বিছিয়ে দেয়। লাও-শুয়ান কাগজের মোড়ক থেকে রক্তরঞ্জিত রুটির টুকরোটা বের করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার পদ্মপাতাটি দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নেয়। ইতিমধ্যে সিয়াও-শুয়ান তার খাওয়া শেষ করে, এবং তার মা তাকে সাবধান করে দেয়, "ওখানেই বসে থাক খোকা, এখন এখানে এসো না।"

মাটির চুলোতে আস্তে আস্তে আগুন জ্বলে উঠতেই বাবা সেই মোড়কটি আখার উপর দেয়। একটা লাল-কালো শিখা জ্বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরূপ গন্ধ সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

"এই যে! বেশ গন্ধ বেরিয়েছে তো, সেই ওষুধটাই কি? খাচ্ছ কি? 'উঠ কুঁজো-পঞ্চম' ঘরে ঢুকেই জানতে চাইল এবং চারিদিকটা শুঁকে নিয়ে

গন্ধটা কিসের জানতে চাইল। যারা সারাদিন চায়ের দোকানে কাটায়, ও তাদেরই একজন। ভোরে সর্বাগ্রে আসে আর রাত্রিতে সবার শেষে যায়। এখন, গলি-পথের একটা টেবিলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বাজে প্রশ্ন শুরু করে দিল।

"চাল ভাজা মিলবে?"

কেউ জবাব দেয় না। লাও-শুয়ান নীরবে তাকে চা পরিবেশন করে।

"সিয়াও-শুয়ান, ভিতরে আয় তো বাবা", হুয়া তা-মা ভিতরের ঘর থেকে ছেলেকে ডাকে। মেঝের মাঝখানে একখানা জলচৌকি পেতে দেয়। ছেলে এসে সেই জলচৌকিতে বসলে মা নীচু গলায় বলে, "এটা খেয়ে ফেল্, তা হলেই অসুখ সেরে যাবে।" এই বলে একখানা রেকাবি তার হাতে তুলে দিল, তাতে আছে একটি গোলাকার কালো পদার্থ।

সিয়াও-শুয়ান জিনিসটা খুঁটে দেখল। মুহূর্তের জন্যে সে একবার কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়, তার মনে হয় যেন নিজের জীবনটা তার নিজেরই হাতে ধরে আছে। সারা অন্তর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অত্যন্ত সাবধানে সে জিনিসটা ভেঙে ফেলে। খানিক সাদা বাষ্প বেরিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ আবার শূন্যে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণে সিয়াও-শুয়ান দেখতে পেল যে দ্বিখণ্ডিত বস্তুটা আর কিছুই নয়, একটা সাদা রুটির টুকরো। এত তাড়াতাড়ি সেটা ওর পেটের ভিতর চলে গেল যে, ওটার স্বাদ স্পষ্ট মনে রাখতে পারল না। তার সামনে খালি রেকাবিখানা পড়ে আছে; একপাশে বাবা দাঁড়িয়ে, আর একদিকে মা। তাদের চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ব্যগ্র দৃষ্টি। তারা যেন সে দৃষ্টি দিয়ে ছেলের দেহে কিছু একটা ঢেলে দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কিছুটা গ্রহণ করতে চাইছে। ব্যাপারটা যথেষ্ট উত্তেজনা পূর্ণ, সিয়াও-শুয়ানের মত দুর্বল ছেলের পক্ষে আরও

বেশী ; তার হৃদপিণ্ডটা খুব জোরে স্পন্দিত হতে লাগল। দু হাতে বুক চেপে ধরে সে কাশতে লাগল।

"একটু ঘুমো, সেরে যাবে।"

কাজেই সিয়াও-শুয়ান মায়ের আদেশে কাশতে কাশতে শুয়ে পড়ল। ছেলে যতক্ষণ না শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ততক্ষণ সে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করল। তার পর সে ছেলের গায়ে একখানি শততালি দেওয়া চাদর চাপা দিয়ে চলে গেল।

৩

চায়ের দোকানে অসংখ্য ক্রেতার ভিড়, লাও-শুয়ান তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে তীর বেগে চলাফেরা করে। প্রত্যেককে গরম জল ও চা পরিবেশন করে। দেখলে মনে হয় যে কাজে তার অখণ্ড মনোযোগ। কিন্তু তার চোখের কোলে কালো গর্ত। "লাও শুয়ান," কে একজন জিজ্ঞাসা করে, লোকটার মুখে কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি, "তোমার শরীরটা কি খারাপ?"

"না তো।"

"না? ... কিন্তু আমি দেখছি তার বিপরীত। তোমার হাসিটা এখন ..." দাড়িওয়ালা লোকটা নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করে।

"লাও-শুয়ান সব সময়ই ব্যস্ত। অবশ্য ওর ছেলেটা—" উঠ-কুঁজো পঞ্চম শুরু করে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি লোকের উপস্থিতিতে তার মন্তব্যটা মাঠে মারা গেল। নবাগতের মুখখানি অতি বৃহৎ, বিকৃত মাংসপেশীবহুল। তার গায়ে একটা কালো সূতীর শার্ট, গলায় বোতাম নেই; এবং একটি চওড়া কালো কোমরবন্ধ দিয়ে কোমর থেকে কাঁধ

পর্যন্ত যেমন-তেমন করে জড়ানো। ঘরে ঢুকেই লাও-শুয়ানকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে:

"খেয়েছে? এখন বেশ ভাল আছে? লাও-শুয়ান, তোমার নসীব ভাল! তা-ই যদি না হবে তো আমি অত তাড়াতাড়ি খবরটা পেলাম কেন .. "

একহাতে কেৎলি আর এক হাতে সম্মান দেখাবার জন্যে মাথা কাৎ করে লাও-শুয়ান কথাটা শুনে একটু হাসে। ক্রেতারা সকলেই পরমাগ্রহে শোনে এবং হুয়া তা-মাও তার নিদ্রাহীন কালো চোখ দুটি নিয়ে এসে উপস্থিত হয়, তার মুখেও হাসি। নবাগতকে খানিকটা চা পাতা ও সবুজ জলপাই দেয়। লাও-শুয়ান নিজে তার পেয়ালায় গরম জল ঢেলে দিল।

"সারবে, নিশ্চয় সারবে, গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। আর সব ওষুধের চেয়ে এ ওষুধ সম্পূর্ণ আলাদা! তার উপর, গরম থাকতেই আনা হয়েছে, খাওয়ার সময়ও গরম ছিল!" রুক্ষ মুখো লোকটা চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"সত্যি বড় কাকা, চ্যান্ যদি চেষ্টা না করতেন তো এরকমটা সম্ভব হত না!" হুয়া তা-মা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকে সাধুবাদ দিল।

"অসুখ যে সারবেই তাতে কিছুই সন্দেহ নেই, কেন না, গ্যারাণ্টি আছে! বিশেষত গরম থাকতেই খেয়েছে। রুটির সঙ্গে মানুষের রক্ত মিশিয়ে খেলে যে-কোন রকমের ক্ষয় রোগ নির্ঘাৎ সারে।"

"ক্ষয়রোগ," কথাটার উল্লেখে হুয়া তা-মা বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠল, কারণ তার মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হাসিও ফিরে এল। এমন অদৃশ্যভাবে সে স্থান ত্যাগ করল যে, বড় কাকা বুঝতেই পারেনি যে ও চলে গেছে, কেন না, বড় কাকা তখনও সাধ্যমতই

চেঁচিয়ে চলেছে। পাশের যে ঘরে সিয়াও-শুয়ান ঘুমোচ্ছে সে ঘর থেকে কর্কশ কাশির শব্দ শোনা যায়।

"তা হলে একথা সত্যি যে সিয়াও-শুয়ানের নসীব ফিরেছে। ওর ব্যারামটা যে নিঃশেষে সেরে যাবে এতে কোন কথা নেই। আর তাই লাও-শুয়ান যে ক্রমাগত হাসছে এতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।" দাড়িওয়ালা বুড়ো বড় কাকার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল। "শুনলাম," শেষোক্ত লোকটিকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলল, "আজ যে লোকটার প্রাণদণ্ড হল সে নাকি সিয়া পরিবারের ছেলে? কার ছেলে বলতে পার? আর তার প্রাণদণ্ডই বা হল কেন?"

"কার?" বড় কাকা জানতে চাইল। "সে কি তবে সিয়াদের ন-বৌয়ের ছেলে? সে ছাড়া আর কে হতে পারে? আর, সে ছেলেটা তো বলতে গেলে একেবারে বাচ্চা!"

যেই বুঝল যে তার সামনে উৎসুক শ্রোতার দল আছে অমনি বড়কাকা একটু গর্ব অনুভব না করে পারল না। তার মুখের মাংসপেশীগুলো অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল এবং কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগল, "আরে বাচ্চাটা মরবার জন্যেই তৈরি হয়ে ছিল। এক কথায়, সে বাঁচতে রাজী হয় নি।"

"আর আমি প্রাণদণ্ডের কাজ শেষ করে কি পেলাম? বলতে গেলে কিছুই পাই নি। ছেলেটার গায়ের জামা কাপড়গুলি পর্যন্ত নিলে ওই লাল-চোখো জেলদারোগা আঃ ইঃ। আর আমাদের লাও-শুয়ান খুড়োই সব চেয়ে ভাগ্যবান। তার পর এলেন সিয়াদের সেজ কর্তা! পুরস্কারের সবটাই তিনি আত্মসাৎ করলেন—তাও বড় কম নয়, পঁচিশ ভরি রূপো!—সবই তিনি নিলেন, কাউকে এক দানাও দিলেন না।"

সিয়াও-শুয়ান ধীরে ধীরে ছোট ঘরখানি থেকে দুহাতে বুক চেপে অবিরাম কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল। রান্না ঘরে ঢুকে একটা থালায় খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত বেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই খেতে শুরু করে দিল। হুয়া তা-মা ছেলের সামনে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "সিয়াও-শুয়ান, একটু ভাল বোধ করছ? আগের মতই খিদে পাচ্ছে?"

"নিশ্চয় সারবে, নিশ্চয় সারবে, গ্যারাণ্টি আছে!" বড়কাকা ছেলেটার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিন্তু তখুনি আবার শ্রোতাদের দিকে ফিরে চেয়ে বলে চলে, "সিয়াদের সেজ কর্তা ভারী শেয়ানা লোক। তিনি যদি গোড়াতেই খবরটা পুলিসকে না জানাতেন তা হলে সিয়াদের বংশে আর কেউ বাঁচত না, বিষয়-সম্পত্তিও সবই সরকারে বাজেয়াপ্ত হত। কিন্তু বিনিময়ে তিনি পেলেন—টাকা।"

"ছেলেটা ছিল ভারী বেয়াড়া, বদমাসের ধাড়ী। কারাধ্যক্ষকে পর্যন্ত বিদ্রোহী করে তুলতে চেয়েছিল!"

"তাই না কি! ভাব একবার, যদি সত্যিই তাই হত!" বছর বিশের একটা ছেলে পিছনের দিককার এক টেবিলে বসে ছিল, ক্রুদ্ধস্বরে সে বলে উঠল।

"তোমাদের জানা থাকা ভাল যে লাল চোখো আহঃ ইহঃ বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্যে উৎসুক ছিল, কাজেই সে আলোচনা শুরু ক'রত। 'তা-চিং বংশ আসলে আমাদের সকলকার,' সে লাল-চোখোকে বলে। কিন্তু তার পর, এ থেকে তোমরা কি বুঝলে? এ রকম কথাবার্তা কি সত্যিকার মানুষের বলে মনে করা সম্ভব?

"লাল-চোখো অবশ্য জানত যে বাড়ীতে ছেলেটার আপনার বলতে এক মা ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু সে এটা ভাবতে পারে নি যে অত গরীব, এক ফোঁটা তেল জলও তার কাছ থেকে নিঙড়ে বার করতে

পারবে না। রাগে তো তার পেট ফেটে পড়বার মতো হল, ছেলেটা কিন্তু তবু গেল 'বাঘের মাথা চুলকোতে।' আঃ ইঃ ছেলেটার মুখে বসিয়ে দিল ধপাধপ কয়েকটা ঘুসি।"

"আঃ ইঃ মুষ্টিযুদ্ধ জানে। তার ঘুষি খেয়ে হতভাগাটার চৈতন্য ফিরে আসবার কথা!" টেবিলের এক কোণ থেকে উঠকুঁজো-পঞ্চম বলে ওঠে।

"তবে আর বলছি কি! বিশ্বাস করবে কিনা জানি নে, ছেলেটা এমন যে একবারও ভয়ে কেঁপে উঠল না। অধিকন্তু সে বলে বসল, 'করুণার বিষয়'!"

কাচা-পাকা চুলো বলল, "সে কি? ও রকম একটাকে মারতে গিয়ে করুণার কথা আসে কোথা থেকে?"

"না, দেখছি তুমি ভাল করে শুনতে পাওনি," বড় কাকা ঘৃণা ভরে নাক সিটকায়। "ছেলেটা বলতে চেয়েছিল যে আঃ ইঃ-কেই বরং করুণা করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের চোখগুলো নির্জীব হয়ে গেল এবং কথা-বার্তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সিয়াও-শুয়ান ঘর্মাক্ত কলেবরে ভাত খাওয়া শেষ করে। তার মাথাটা তখন ঘুরচে।

"ছেলেটা লাল-চোখোকে বললে যে, ওকেই করুণা করতে হয়!—এ যে একেবারে খাঁটি পাগলামি!" আলোচনার একটা যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে পেরেছে মনে করে কাঁচা-পাকা-চুলো মনে মনে বেশ গর্বিত হয়ে ওঠে। "ছেলেটা দস্তুর মত পাগল হয়ে গেছল!"

"পাগল হয়ে গেছল," একটু আগে যে ছোকরা কথা বলছিল সে অনুমোদনের সুরে প্রতিধ্বনি করে। সেও যেন কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছে!

ইতিমধ্যে চায়ের দোকানের আড্ডাধারীদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে। তারা আবার হাসি গল্প শুরু করল। সিয়াও-শুয়ান তার নির্জীব দুর্বল দেহে যতটা সম্ভব ভীষণভাবে কাশতে শুরু করে দেয়।

বড়কাকা ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাছে গিয়ে বলে, 'সারবে, নিশ্চয় সারবে, হলপ করে বলছি সিয়াও-শুয়ান! অমন করে আর কেশো না, বুঝলে, হলপ করে বলছি!'

'একেবারে পাগল হয়ে গেছে,' উঠকুঁজো-পঞ্চম মাথা নেড়ে বলে।

৪

শহরের পশ্চিম তোরণের একটু দূরে দেওয়ালের গায়ে যে জমিটা আছে তা আসলে ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি। সেই জমির উপর এখন যে সরু বাঁকা পথটি পড়েছে তা মানুষের পায়ে পায়ে পথ সংক্ষেপের তাগিদে গড়ে ওঠে, কিন্তু কালক্রমে তা-ই স্বাভাবিক সীমা-রেখায় পরিণত হয়েছে। তোরণ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বাঁ দিকের জমিতে সেই সব লোককে কবর দেওয়া হয় যাদের প্রাণদণ্ড হয় বা অনাহারে কারাগারে মারা যায়। আর ডান দিকের জমিটায় নিঃস্বদের কবরের সারি রয়েছে। এই কবরগুলো সংখ্যায় এত বেশী ও এত গায়ে গায়ে রয়েছে যে, বড়-লোকের বাড়ীতে জন্মোৎসবে মিঠাই-সন্দেশ যেমন করে সাজিয়ে রাখে, ওই কবরগুলি দেখেও যেন তা-ই মনে হয়।

বৈশাখ মাস, সূর্যালোকে চারদিক উজ্জ্বল। এ দিনে আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতের কবরে আসে শ্রদ্ধা, প্রেম ও স্নেহ ঢেলে দিতে। সেদিনের সকালটাও ছিল অসাধারণ রকম স্নিগ্ধ এবং পত্রহীন উইলো গাছে নতুন পাতার উদ্গম শুরু হয়েছে মাত্র। হুয়া তা-মা ডান দিকের সমাধিস্থানের একটি সদ্য গড়া কবরের সামনে চারটি

মাছ ও এক বাটি মি-ফ্যান ঢেলে দিল, তারপর নীরবে কাঁদতে লাগল, নকল টাকাও পোড়াল। তারপর সে স্তব্ধভাবে মাটিতে বসে রইল—যেন সে কিছুর প্রতীক্ষা করছে কিন্তু তার সে প্রতীক্ষার বস্তুটি যে কি তা সে বলতে পারে না। মৃদু বাতাস বইছে, তার মাথার ছোট ছোট চুলগুলো সেই বাতাসে দুলছে। গেল বছর থেকে এবারে তার চুলগুলো আরও বেশী পেকে গেছে।

সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে আর একটি স্ত্রীলোকও এল। সেও বুড়ী, তার পরনেও ছেঁড়া জামাকাপড়। হাতে একটি গোল ধামা, ধামাটি রঙীন, তাতে কাগজের খামি ঝুলছে। দু-একবার থেমে আস্তে আস্তে সে হেঁটে আসছে; কাছাকাছি আসতেই তার নজরে পড়ল, হুয়া তা-মা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ফলে তার মনে দ্বিধা এল, সে একটু ঘাবড়ে গেল। তার বিবর্ণ করুণ মুখখানির উপরে একটা বিশৃঙ্খল লজ্জা এসে তাকে অভিভূত করে ফেললে। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে সে বাঁ দিকের কবরের দিকে ধীর মন্থর পদে এগিয়ে গেল। রঙিন ধামাটি কবরের একপাশে নামিয়ে রাখল।

এই কবরটি সিয়াও-শুয়ানের কবরের ঠিক বিপরীত দিকে, মাঝখানে একটি সংকীর্ণ গলি-পথ। হুয়া তা-মা যন্ত্রচালিতের মত কবরে চারটি মাছ, এক বাটি চাল দিল, কাগজের নকল টাকা পোড়াল, তারপর কাঁদল। তার মনে হল, ওই কবরে যে আছে সেও কোনো এক মায়ের ছেলে। ওই স্ত্রীলোকটি অন্যমনস্কভাবে নড়াচড়া করছে, হুয়া তা-মা কৌতূহলের সঙ্গে দেখে। স্ত্রীলোকটির দৃষ্টিতে একটা শূন্যতা। সহসা দেখল যে, স্ত্রীলোকটি কাঁপছে, টলমল করে পিছনে হটল—যেন সে সংজ্ঞাহীন।

হুয়া তা-মা গলে গেল। 'উনি হয় তো শোকে পাগল হয়ে গেছেন,'

ও আশঙ্কা করল। উঠে গলি-পথ দিয়ে স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে ধীরভাবে তাকে বলল, 'বুড়ি-মা, আর শোক করো না। চল, দুজনেই এখন বাড়ী যাই।' স্ত্রীলোকটি বোকার মত মাথা নাড়ল। চোখ দুটি কিন্তু তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অন্য এক দিকে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওই দেখ! ওটা কি?'

স্ত্রীলোকটি আঙুল তুলে যে দিকে দেখাল সেই দিকে তাকিয়ে হুয়া তা-মার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাদের সামনেকার একটি কবরে। কবরটি উঁচু-নীচু এবং হলদে মাটির কুশ্রী পটি দেওয়া। আরও কাছে গিয়ে সে চমকে উঠল এই দেখে যে, ছোট্ট টিপিটার চুড়োয় ছোট ছোট গোলাকার টকটকে লাল ও সাদা ফুল ফুটে রয়েছে।

তারা কেউ এত দিন এত স্পষ্ট করে অমন ফুল দেখেনি, আজই কেবল টাটকা ফোটা ফুলগুলি দেখতে পেল। সংখ্যায় খুব বেশী নয়, তা হলেও বেশ যেন সাজানো গুছানো, দেখতেও যে খুব চমৎকার, তাও নয়, তবে বেশ সুশ্রীভাবে পর পর সাজানো। হুয়া তা-মা সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের কবর ও সেই সঙ্গে আর আর কবরগুলির দিকে তাকাল, শুধু এখানে সেখানে দু-একটি সাদা ও নীল ফুল শীতের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফুটে রয়েছে দেখল। আর একটিও টক্‌টকে লাল ফুল দেখা গেল না। একটা নাম-না-জানা শূন্যতায় তার অন্তরটা ভরে গেল, কেন যে এমন হলো সে তা জানতে পর্যন্ত চাইল না। অন্য স্ত্রীলোকটি কাছে গিয়ে ফুলগুলি ভাল করে দেখল। 'এর অর্থ কি?' আপন মনেই সে জিজ্ঞাসা করে। তার দু-গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে থাকে। সে কেঁদে উঠল:

"ইউ, বাছা আমার! তোমার প্রতি অবিচার হয়েছে কিন্তু তুমি তা ভুলো না। তোমার অন্তর কি এখনও বেদনায় ভরপুর

রয়েছে এবং তুমি কি তা আজ এমনি করেই চাও?' তারপর সে চার দিকে তাকাল, কিন্তু যখন দেখল যে একটা নেড়া গাছে একটা কাক নীরবে বসে আছে, তখন সে আবার আপনার মনে বলে উঠল: 'ইউ, ইউ, বাছা আমার! এটা একটা ফাঁদ; তোমাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। ভগবান জানেন সত্যি কি মিথ্যে! শান্তিতে ঘুমোও তুমি, কিন্তু আমাকে একটা কিছু প্রমাণ দাও। যদি তুমি সত্যি সত্যিই এই কবরের ভেতর থেকে থাক, যদি আমার কথা শুনতে পাও, তা হলে এই মুহূর্তে ওই দাঁড়কাকটা উড়ে গিয়ে তোমার কবরের উপর বসুক। আমায় জানতে দাও!'

আর বাতাস বইছে না এবং চার দিকেই শুকনো ঘাসগুলো তামার কুচির মত খাড়া হয়ে আছে। আকাশে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, প্রতিধ্বনিও শোনা যায়, ক্রমেই শব্দটা অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে লাগল। অবশেষে সেটা আর একদম শোনা গেল না। চার দিকে সব কিছুই মৃত্যুর মত শান্ত। শুকনো ঘাসের উপর দুটি বৃদ্ধা নারী নিশ্চল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকটাকে দেখতে লাগল। সোজা গাছের উপর কাকটা মাথা নীচু করে অনড় হয়ে বসে আছে— যেন লোহার তৈরি।

অনেকটা সময় কেটে যায়। কবরে দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। হুয়া তা-মার মনে হল, যেন একটা গুরুভার বোঝা তার কাঁধ থেকে নামল এবং অপর স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে সে বলে উঠল, "চল, আমরা যাই।"

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপ্রসন্নমনে বাসন-কোসন যা এনেছিল সেগুলি গুছিয়ে নিল। তারপর আরও কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে

কাটাল, অবশেষে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যেতে যেতে আপন মনেই বলতে বলতে চলল, 'এটার অর্থ কি ?'

তারা প্রায় গোটা তিরিশেক পা এগিয়েছে, এমন সময় শূন্য থেকে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনতে পেল।

'কা—কা— !'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল, কাকটা পাখা ঝাপটা দিয়ে তীরের মত বেগে অসীম শূন্যে উড়ে যাচ্ছে।
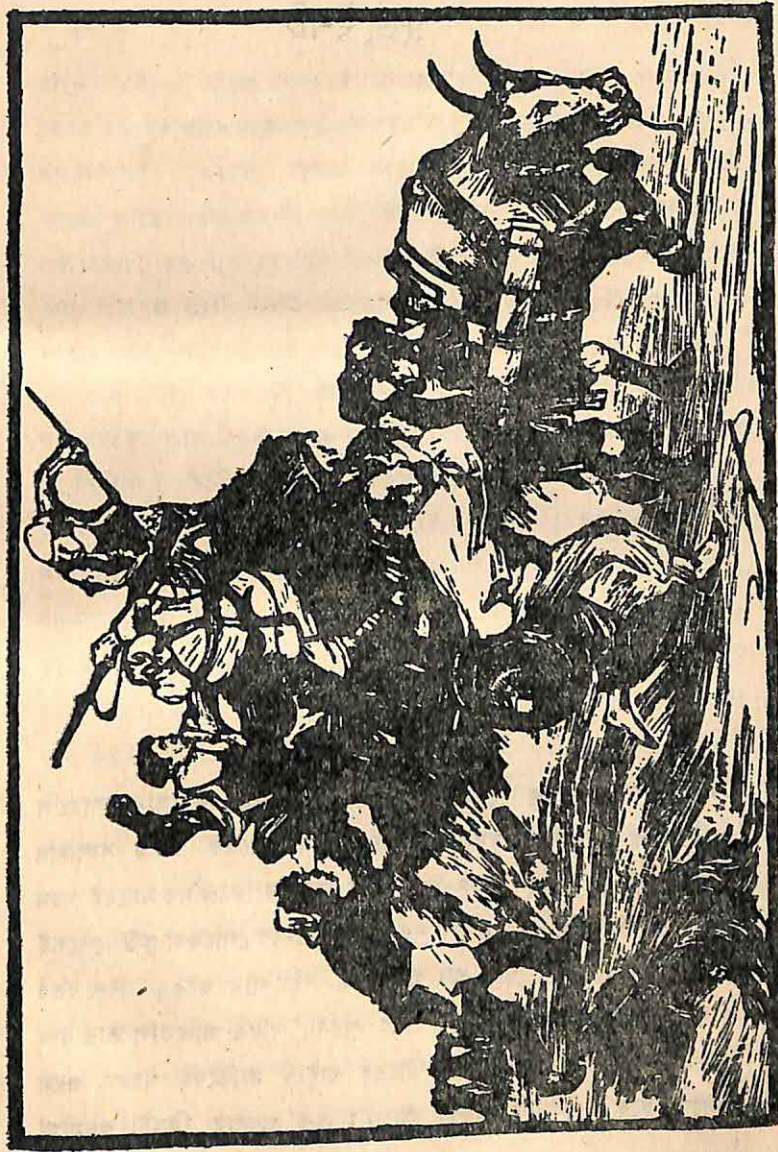
শত্রুর হাত থেকে চীন-কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রাম (চীন উডকাট)   শিল্পী ঃ ইয়েন হান

কুঙ্ ই-চি

চীন দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় লো-চিঙ-এর পানশালাগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। যেমন, প্রত্যেক পানশালাতেই একটি সমকোণ কাউণ্টারের ভিতরের দিকে মদ গরম করবার জন্যে সব সময়েই গরম জলের সুব্যবস্থা আছে। দুপুরে সন্ধ্যায় কারখানার লোকেরা ছুটি পেলেই এই সকল পানশালায় গিয়ে এক-আধ পাত্র মদ্য পান করে। বিশ বছর আগে এক পাত্রের দাম ছিল চার পয়সা, যদিও আজকাল তার দাম হয়েছে দশ পয়সা—তাও কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়েই গরম গরম গিলতে হবে। চাটের ব্যবস্থা আছে : এক পয়সার কিছুটা নুণমাখা

বাঁশের কোঁড়া, নয়ত মসলা দেওয়া কড়াইশুঁটি। আর দশ পয়সায় যে-কোন রকমের মাংস এক পাত্র পাওয়া যায়; খদ্দেরদের বেশীর ভাগই খাটো-জামা (খাটো জামা—সাধারণ গরীব) শ্রেণীর, কাজেই তাদের কাছে পয়সা কখনই বেশী থাকে না। কেবল মাত্র জনকয়েক লম্বা-জামা (ভদ্রলোক) শ্রেণীর লোক কাউণ্টারের ভিতরে ঢুকতে পারে এবং পাশের ছোট ছোট কামরায় বসে মদ-মাংস দু-ই ধীরে সুস্থে আরাম করে উপভোগ করে।

আমার বয়স যখন বার, তখন লো চিঙ-এর কোন একটি পানশালায় পরিচারকের কাজ পাই। দোকানটির নাম 'সর্বমঙ্গলা'—ঠিক শহরের প্রবেশ-মুখে। মালিক আমার চেহারা দেখে স্থির করলেন যে, লম্বা-জামাওয়ালাদের নিয়ে আমি সামাল দিতে পারব না; কাজেই আমাকে কাউণ্টারের ভিতরে কাজ দেওয়া হল। খাটো জামাওয়ালাদের সামলানো অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তারা অতিমাত্রায় হৈ-চৈ করে; তা ছাড়া, নোংরামি ছেঁচড়ামিতেও সিদ্ধহস্ত। কাউণ্টারের ও-পাশে যখন পিপে থেকে খদ্দেরদের জন্যে মদ ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তারা কাউণ্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজের চোখে দেখে নেয় সে-পাত্রে সত্যি খাঁটি মদ দেওয়া হচ্ছে, না, তলায় কিছুটা জল রাখা হয়েছে। পিপে থেকে মদ ঢেলে সেটা গরম জলে বসানো পর্যন্ত ভেজাল সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সতর্ক-দৃষ্টি রাখে। এ রকম কড়া তদারকের মুখে মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দেওয়া সুকঠিন,—দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই দিন কয়েকের মধ্যেই পানশালার মালিক স্থির বুঝে নিলেন যে, এ কাজে আমি নেহাৎ আনাড়ী। অপর পক্ষে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও দোকানী আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারল না। কেন না, সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তির সুপারিশে আমি কাজে বহাল হয়েছি, এ প্রতিষ্ঠানে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি

ছিল। কাজেই ঠিক হল, আমাকে রাখতেই হবে, তবে এবারে যে কাজের ভার আমাকে দেওয়া হল সেটা সত্যি বড় বিরক্তিকর। এবারে পেলাম মদ গরম করবার কাজ।

সারা দিন কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে হত। এ কাজে মুনিব খুশি হল বটে, কিন্তু সারা দিন অবিশ্রান্ত ভাবে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক এক সময় ভারী একঘেয়ে লাগত। দোকানী লোকটি ছিল অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির, আর খদ্দেররা নির্জীব, তাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও বিরক্তিকর। এদের নিয়ে হাসি-খুশি থাকা এক রকম অসম্ভব। একমাত্র কুঙ্ ই-চি যখন মদ্যপান করতে আসত, তখনই যা-হোক একটু আমোদ পেতাম, আর সেই কারণেই হয়ত কুঙ্ ই-চির কথা আমার এখনও মনে আছে।

কুঙ্ ই-চিই শুধু একমাত্র লম্বা-জামাওয়ালা – যে কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করত। লোকটি আকৃতিতে লম্বা, সব মিলিয়ে দেখতে বৃহৎ। মুখখানি আশ্চর্য রকমের বিবর্ণ, এখানে সেখানে মেছেতা; বলিরেখাগুলোর পাশে পাশে কাটা ও আঘাতের দাগ। চিবুকে লম্বা পাকা দাড়ি যেন ছিটকে এসে ঝুলে পড়েছে। গায়ের কোটটি সত্যি লম্বা, কিন্তু বেশ ছেঁড়া, ময়লা; দেখে মনে হয়, বছর দশেক তা ধোয়া বা মেরামত হয়নি। কথা বলতে গেলেই সে মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করত যে, সেগুলো সাধারণত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল, জনসাধারণের কাছে তা সম্পূর্ণ অবোধ্য। সে যখনই পানশালায় আসত তখন প্রত্যেকেই তার দিকে চেয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ টিপে হাসত। কেউ হয়ত বলে উঠত, 'এই যে কুঙ্ ই-চি, তোমার মুখে আঘাতের নতুন দাগ দেখছি যে!'

সে যেন কথাটা শুনেও শুনতো না। কাউণ্টারের দিকে ফিরে

চেয়ে সে বলে উঠত,—'দু-পাত্তর গরম কর, আর এক রেকাবি কড়াই-শুঁটি!' সঙ্গে সঙ্গে ন-টি পয়সা গুণে সে কাউণ্টারে থাক দিয়ে রাখত।

'আবার নিশ্চয়ই চুরি করেছ!' কে এক জন অনাবশ্যক উচ্চ-কণ্ঠে বলে ওঠে।

'কেমন করে এক জনের চরিত্র সম্বন্ধে খামকা সন্দেহ প্রকাশ করছ?' চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে সে জবাব দেয়।

'কী চরিত্রের কথাই বলছ? হো-দের বাড়ী থেকে বই চুরি করার দায়ে কি সে-দিন তোমাকে মার খেতে দেখিনি বলতে চাও?'

কুঙ্ ই-চির মুখ বিকৃত হল, কপালের নীল শিরাগুলি বেরিয়ে পড়ল। সে জবাব দিল,—'বই চুরি করাকে কেউ কখনও চুরি আখ্যা দেয় না! বই চুরি নিছক পণ্ডিতের কাজ—তাকেই কি না তুমি বলতে চাও চুরি?' তার পর সে ক্রমাগত বাজে উদ্ধৃতি করে করে বলতে লাগল,—'সত্যিকার যে মানুষ সে শত অভাবে অনটনেও আপন মনে খুশিই থাকে।' পরে সঙ্গে সঙ্গে তার সাধু ভাষার শব্দবৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। উপস্থিত সকলেই হো-হো করে হাসতে লাগল এবং প্রত্যেকেই বেশ খুশি বলেই মনে হল।

অবশ্য কুঙ ই-চির অসাক্ষাতে সকলেই বলাবলি করত যে, লোকটা এক সময় ভাল করে লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করেছে। নিজের আবশ্যক ব্যয়নির্বাহের জন্যে উপার্জনের কোন সুযোগই ছিল না। ক্রমে সে অভাবের এমন স্তরে এসে পৌছল যে, ভিক্ষা ছাড়া আর কোন উপায়ই তার রইল না। তবে তার একটি মাত্র সদ্গুণ ছিল, সেটি হচ্ছে তার হস্তাক্ষর। অনুলিপির কাজ সে প্রচুর করতে পারত এবং তার থেকে তার জীবিকার্জন অনায়াসেই চলতে পারত। কিন্তু মদ্যপানে আত্যন্তিক অনুরাগ, কাজে

অতিমাত্রায় আলস্য এবং কাজ হাতে নিয়ে দু'দিন কাজ করতে না করতেই বই, কাগজপত্র ও লেখার সরঞ্জামসহ হঠাৎ তার অন্তর্ধান ইত্যাদি ঘটনা বারংবার ঘটায় তার পক্ষে শেষটায় কাজ পাওয়াই হয়ে ওঠে অসম্ভব এবং অন্য কোন কাজের যোগ্যতা না থাকায় সে মধ্যে মধ্যে এক-আধটুকু চুরি করতে বাধ্য হল।

আমাদের পানশালায় কিন্তু তার ব্যবহার, বলতে গেলে, একেবারে অনুকরণযোগ্য। ধার পরিশোধে সে কখনও ত্রুটি করত না, যদিও সময় সময় ধার থেকে যেত এবং দোকানের খাতকদের নামের যে তালিকা ও ধারের পরিমাণ দেয়ালে সাদা বোর্ডে লটকিয়ে দেওয়া হত, সেখানে তার নামও সময় সময় থাকত। কিন্তু প্রতিবারেই সে তার ঋণ পরিশোধ করত।

পূর্বে যে দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে দিন পাত্রের আধাআধি মদ্য পান করার পর আস্তে আস্তে তার মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা ফিরে এল এবং কে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, তুমি সত্যি সত্যিই লেখাপড়া জান?' প্রশ্নটা শুনে সে প্রশ্নকারীর দিকে উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকাল। লোকটার বলা তখনও শেষ হয়নি, সে বললে,—'যদি সত্যই তুমি লেখাপড়া জান তো উপাধি পাওনি কেন?'

সঙ্গে সঙ্গেই কুঙ্ ই-চি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার কালশিরা-ওঠা মুখখানি হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। কি যেন সে বিড় বিড় করে বলল, কিন্তু তার এক বর্ণও বোঝা গেল না। আবার তারা সজোরে হেসে উঠল।

এ রকম হাসি-তামাসার ব্যাপারে সকলের সঙ্গে আমার যোগদানে দোকানীর যে বিশেষ আপত্তি ছিল না তার প্রমাণ, সে কখনও আমাকে এর জন্যে তিরস্কার করেনি। খদ্দেরদের খুশি রাখার দিকে

অবশ্য তার যথেষ্ট সতর্ক-দৃষ্টি ছিল। এমন কি, তাদের হাসি-তামাসায় মসগুল রাখবার জন্যে কুঙ্ ই-চিকেও সময় সময় অনুরোধ করত। কিন্তু কুঙ ই-চি খদ্দেরদের সঙ্গে আলাপ করতে ঘৃণা বোধ করত; বরং সে সময় পেলে ও খেয়াল হলে পল্লীর ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলত।

একদিন আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল আমি লেখাপড়া জানি কি না, কোন বই পড়েছি কি না? মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানালাম।

'তাই না কি?' সে বললে,—'তুমি যখন বই পড়েছ বলছ, তখন এক দিন তোমার পরীক্ষা নিতে হবে। আচ্ছা, বল তো মসলাযুক্ত কড়াইশুঁটি লিখতে যে 'ওয়েই' বর্ণটি আছে সেটি কেমন করে লিখতে হয়?'

মনে মনে ভাবলাম,—'এই ভিকিরীর মত লোকটা কি আমার পরীক্ষা নেওয়ার যোগ্য?' এবং কথাটা ভেবেই তাকে এক রকম উপেক্ষা করেই মুখ ফেরালুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার একান্ত আগ্রহ নিয়ে সে বলল: 'তা হলে এইটেই কি বুঝব যে, তুমি ওই অক্ষরটা লিখতে জান না, তাই কি? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, এ রকম শব্দ মনে করে রাখতে হবে। তুমি যখন এক দিন নিজেই এই রকম দোকানী হয়ে বসবে তখন তোমাকে হিসেব রাখতে গিয়ে এই শব্দগুলি বার বার লিখতে হবে।'

আপন মনেই বলে উঠলাম, আমার পক্ষে দোকানী হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাছাড়া হিসেব লিখতে গিয়ে কখনও 'মশলাযুক্ত কড়াই-শুঁটি' খাতায় লিখতে আমার মুনিবকে দেখিনি। কিন্তু তবু কৌতূহল

ও বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলাম : 'শেখাতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? 'ঘাস' লিখতেও ওই অক্ষরটার প্রয়োজন হয় না কি ?'

কুঙ্ ই-চি কথাটা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং খুশির আতিশয্যে সে তার লম্বা লম্বা ছ'টো আঙুলের নখ দিয়ে কাউণ্টারের উপর ঠোক্কর মারল।

'ঠিক, ঠিক !' আবেগে সে চিৎকার করে উঠল। 'কিন্তু ওই অক্ষরটি ভিন্ন ভিন্ন চার রকমে লেখা যায়। আচ্ছা, তুমি সব কটাই জান তো ?

আমি এরপর বিরক্তিবোধ না করে পারলাম না। মুখ ভেংচিয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। কুঙ্ ই-চি তার লম্বা নখগুলো মদের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কাউণ্টারের উপর সেই নখ দিয়ে অক্ষর লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি উৎসাহিত নই দেখে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছুটিতে একটা করুণ বেদনার ছায়া দেখা দিল।

সময় সময় সে যখন দোকানে আসত মদ্যপান করার জন্যে, তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসত একটা হাসিখুশির ভাব। এমনি এক দিনের কথা বলছি। কুঙ্ ই-চি এল, দেখতে দেখতে পল্লীর ছেলেমেয়েরাও এসে জুটল এবং তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ সুরু করে দিল। প্রত্যেককে একটি করে কড়াইশুঁটি দিল এবং তারা খেয়ে নিয়ে আরও পাওয়ার আশায় তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাত্রের অবশিষ্ট কড়াইশুঁটিগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাদের খ্যাপাবার মতলবে সে কড়াই-শুঁটিগুলোর দিকে আঙুল প্রসারিত করে হেঁট হয়ে তাদের কানে কানে বলল, 'গোটাকয়েক মাত্র আছে, আমার তো খুব বেশী ছিল না।' তার পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনেই বলে উঠল, 'কি করব। বেশী না, বেশী না। বেশী হুৎসাই !' বলতে বলতে আবার শুদ্ধ ভাষার বাছা-বাছা শব্দগুলি আওড়াতে সুরু করে দিল, আর ছেলেরা সে সব শুনে হাসতে হাসতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শারদোৎসবের সময়ে একদিন আমার মুনিব হিসেব মেলাতে গিয়ে সাদা বোর্ডটা নিয়ে তাতে লিখল, 'কুঙ্‌ই-চির অনেক দিন দেখা নেই। তার কাছে উনিশ পয়সা পাওনা আছে।'

সে যে অনেক দিন আসেনি এটা আমারও খেয়াল হয়নি।

'আসবে কেমন করে? খুব মার খেয়েছে। এবারে দু'টো পা-ই ভেঙে গেছে।' কে একজন খদ্দের খবরটি পরিবেশন করল।

'তাই না কি!'

'হাঁ, আবার চুরি করে ধরা পড়েছিল। লোকটা একেবারে অসীম সাহসী, পাগল বললেও হয়। কর্‌বি তো কর্‌ একেবারে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তিঙ্‌-এর বাড়ীতেই কি না চুরি করতে গেল! ধরা পড়তেই হবে। পড়লও।'

'তারপর কি হল?'

'তারপর কি হল!—কেন, প্রথমে অপরাধ স্বীকার ক'রে মুচলেকা লিখে দিতে হল, তারপর সুরু হল মার; সে মার বলে মার! চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলল। ফলে দু'টো পা-ই গুঁড়িয়ে গেছে।'

'তারপর?'

'সে এখন খোঁড়া!'

'এখন কেমন আছে?'

'কে জানে? হয় ত অক্কা পেয়েছে।'

দোকানী আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, হিসেবের ঠিক দিতে সুরু করল।

শারদোৎসব শেষ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীত এসে পড়ল। সারা দিন আমাকে চুলোর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও বালাপোষের জামা পরতে হচ্ছে। এক দিন বিকেলে

দোকানে তখন একটিও খদ্দের নেই। শরীরটা ক্লান্ত। চুপ করে চোখ দু'টো বুজে বসেছিলাম।

'এক পাত্তর গরম কর।'

চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালাম। গলার স্বর খুব দুর্বল, তাহলেও পরিচিত বলেই মনে হল। চার দিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই! তখন উঠে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের উপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি—কুঙ্ ই-চি মেঝেতে বসে দেহলীর দিকে চেয়ে রয়েছে। মুখখানি শীর্ণ ও কালো হয়ে গেছে, তার উপর দিয়ে যেন দুর্দশার ঝড় বয়ে গেছে। গায়ে একটা ছেঁড়া ডোরা-কাটা কোট, খোঁড়া পায়ের উপর বসে আছে, পা দু'খানি আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি খড়ের টুকরি, খড়ের পাকানো দড়ি দিয়ে তার গলায় ঝুলানো। আমাকে দেখেই সে নীচু গলায় আবার বলে উঠল, 'এক পাত্তর।'

দোকানী মাথা তুলে কাউন্টারের উপর দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এই যে কুঙ ই-চি, তোমার কাছে কিছু পাওনা আছে—উনিশ পয়সা।'

নির্জীবের মত মাথাটা তুলে বিড়-বিড় করে বলল, 'হাঁ, মনে আছে। আর বারে দিয়ে যাবো, আজ নয়। তবে আজকের পয়সা নগদই দিচ্ছি। জিনিসটা যেন ভাল হয়।'

কথাটা শুনে দোকানী যথারীতি মুচকি হাসল, পরে মন্তব্য করল, 'আবার চুরি?'

প্রতিবাদ বা অস্বীকার কিছুই সে করল না, কেবল সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ঠাট্টা রাখো।'

'ঠাট্টা? চুরি যদি নয় তো এ সব কি? পা দু'টো ভেঙে খোঁড়া হয়ে গেছে কেন বলো তো?'

'ভাঙা?' ক্ষীণস্বরে সে বলল, 'কেন, পড়ে গিয়ে ভেঙেছে, ... পড়ে গেছলাম।' তার দৃষ্টি যেন বলছিল, দোহাই তোমার, আলোচনাটা বন্ধ রাখো।

এমন সময় জন কয়েক খদ্দের এসে হাজির হল। এবং তারা ওকে দেখেই ব্যাপার বুঝতে পেরে দোকানীর সঙ্গে হাসা-হাসিতে যোগ দিল। আমি মদ গরম করে নিয়ে কুঙ্ ই-চিকে ধরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেও পকেট হাতড়ে চারটি পয়সা আমার হাতে দিল। তার প্রসারিত হাতখানির দিকে নজর পড়তেই দেখলাম—কাদা মাখা। বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সারাটা পথ সে হাতে ভর দিয়েই হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসেছে। অন্য দিনের তুলনায় সেদিন সে মদ্যপানে বেশ একটু সময় নিল। ইতিমধ্যে দোকানে ভিড় জমে গেছে, পানাহার হুল্লোড়ে গম্-গম্ করছে। আমরা কুঙ্ ই-চির দিকে আর নজর রাখতে পারিনি। কখন যে সে আবার হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে গেল, জানতেও পারিনি।

তার পর অনেক দিন আর তাকে দেখা গেল না। বছর শেষে দোকানী হিসেব মেলাতে গিয়ে সাদা বোর্ডখানি নামিয়ে নিয়ে পড়ে বললে, 'কুঙ্ ই-চির পয়সা এখনও পাওয়া যায়নি। উনিশ পয়সা।' পরের বছরও দোকানী ওই কথাই বলল। শারোদৎসবের সময় আর উল্লেখও করল না।

তারপর আজও তার কোন খবর পাইনি। এবারে হয়তো সত্যিই সে মারা গেছে।

একটি ছোট্ট ঘটনা

পাড়াগাঁ থেকে রাজধানীতে এসেছি ছ-বছর হয়েছে, তবু মনে হয় যেন এই সেদিন। ইতিমধ্যে মহানগরীতে অনেক কিছু ঘটেছে, 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপার' বলে যেগুলির পরিচয়, তার অনেকগুলিই নিজের চোখে দেখেছি বা কানে শুনেছি। তাদের কোনটাই আমার মনকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি, বরং সে সবের কথা পাড়লে মেজাজটাই আমার একদম বিগড়ে যায় এবং দিনের পর দিনই মানুষের উপর একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আসে। কিন্তু একটি মাত্র ছোট ঘটনাই আমার মনে একটা গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে, আজও সেটি ভুলতে পারি নি।

ছ-বছর হলো প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শীতকাল। সেদিন প্রচণ্ড বেগে উত্তুরে হাওয়া বইছে। জীবিকার্জনের জন্যে আমাকে খুব ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়তে হয়। রাস্তায় তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি, কাজেই আমার সঙ্গে কারুরই বড় একটা দেখা মিলল না। অনেক কষ্টে একখানা রিক্সা ভাড়া করবার সুযোগ পেলাম। রিক্সাওআলাকে বললাম, দক্ষিণ তোরণে যেতে হবে।

একটুবাদেই বাতাসের বেগ কিছুটা কমে এলো। বাতাসের তোড়ে রাস্তার ধূলা বালি সবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। রিক্সাওআলা দৌড়ে চলল। প্রায় গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌচেছি, এমন সময় কে একজন আমাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে এলো, রিক্সায় তার কাপড় জড়িয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সে আর কেউ নয়, একজন বুড়ী। তার মাথার চুলে পাক ধরেছে, পরনে ছেঁড়া জামা-কাপড়। হঠাৎ সে রাস্তার একপাশ থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এলো এবং আমাদের সামনে দিয়েই রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল। রিক্সাওআলা গাড়ীটাকে একপাশে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল কিন্তু বুড়ীর ছেঁড়া জামায় বোতাম লাগানো ছিল না, বাতাসে সেটা উড়ছিল। ফলে হাতলে সে আটকে গেল। ভাগ্য ভাল যে রিক্সাওআলা সঙ্গে সঙ্গেই তার গতিবেগ রুখতে পেরেছিল, নইলে বুড়ীর গায়ের উপর দিয়েই রিক্সা চলে গিয়ে সাংঘাতিক ভাবে জখম করত। আমরা থেমে গেলাম, কিন্তু তবু সে দু-হাত দু-পায়ে হাঁটুগেড়ে বসে রইল। সে যে কিছুমাত্র আঘাত পেয়েছে, আমার তা মনে হলো না। রিক্সার সঙ্গে তার এই সংঘর্ষ আর কারুরই নজরে পড়েনি, গাড়ীটা থামানো হলো দেখে ভারী বিরক্ত হলাম। লোকটা বোকামীর জন্যে স্বেচ্ছায় একটা গোলমালের প্রশ্রয় দিল বলে

আমার মনে হল। সেই সঙ্গে আমার কর্মস্থানে পৌঁছতেও বেশ বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

'ও কিছু নয়,' আমি বললাম, 'তুমি চালাও।' কিন্তু সে হয় আমার কথা শুনতে পেল না, নয়তো গ্রাহ্যই করল না। কেন না, সে গাড়ীর হাতলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বুড়ীকে ধরে তুলল। বুড়ীর দু-হাত ধরে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'লাগেনি তো তোমার ?'

'হাঁ, লেগেছে।'

আমি আপন মনেই বলে উঠলাম, 'তুমিই তো পড়ে গেলে দেখলাম, ওর দোষ কি! তোমার লাগবে কেমন করে ? মিছেমিছি লাগার ভান করছ।' গোটা ব্যাপারটাই ভারী বিরক্তিকর, আর এ ব্যাটা রিক্সাওআলা নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে। এখন সে যেমন করে পারে ঠ্যালা সামলাক।

কিন্তু যে-মুহূর্তে বুড়ী বলল যে তার লেগেছে, তখখুনি রিক্সাওআলার যেন আর এতটুকু সংশয় রইল না। বুড়ীর হাত দু-খানি ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। বিস্ময়ে অবাক হয়ে হঠাৎ চেয়ে দেখি, সামনেই একটা পুলিসের থানা এবং আরও দেখলাম যে, রিক্সাওআলা বুড়ীকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে তখন সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না, কাজেই সে-ই বুড়ীকে ভিতরে নিয়ে গেল।

তারা দুজন দৃষ্টির আড়াল হতেই আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। জানি নে কেন, হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে ধূলোমাখা লোকটার দেহটা দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল এবং যতই সে এগিয়ে যাচ্ছে ততই সে বড় হতে লাগল, অবশেষে তার মুখের দিকে তাকাবার জন্যে আমাকে মাথাটা তুলে চাইতেই হল। ঠিক এই সময়

আমার সর্বাঙ্গে একটা চাপ অনুভব করলাম। আর সে চাপটা যেন তারই দিক থেকে আসছে। আমার দামী গরম জামা-কাপড়ের আড়ালে যে সব ক্ষুদ্রতা ছিল সেগুলি যেন সব ঝেড়ে পুছে বেরিয়ে এলো বলেই মনে হলো। নিজেকে দুর্বল বোধ করতে লাগলাম, আমার প্রাণশক্তি যেন শেষ হয়ে এসেছে, যেন দেহের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। অসাড়, নির্বাক ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেই রইলাম। এমন সময় থানার ভিতর থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। লোকটি আমার সামনে আসতেই তাড়াতাড়ি রিক্সা থেকে নেমে পড়লাম।

'আর একটা রিক্সা দেখুন,' আমাকে নির্দেশ দিল। 'এ লোকটা আর আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

কিছু না ভেবেই আমার হাতখানি জামার পকেটে ঢোকালাম এবং মুঠোয় যতটা ওঠে পয়সা তুলে নিলাম।

'ওকে পয়সা কটা দেবেন,' বললাম।

ইতিমধ্যে বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তা তখনও জনবিরল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ভাবতে সাহস হল না। একটু আগে কি হয়ে গেছে, তার কথা মন থেকে এক পাশে সরিয়ে রেখে পয়সাগুলোর সম্পর্কে আপনার মনেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলাম। আচ্ছা, পয়সাগুলি কেন দিলাম? ও পুরস্কার? আমার এ আচরণের পর কি নিজেকে আর রিক্সাওআলার বিচার করবার অধিকারী মনে করতে পারি? আমার বিবেকের কাছে এর কোনো কৈফিয়ৎই দিতে পারলাম না।

তখন থেকেই ঘটনাটা আমার মনে জ্বল্ জ্বল্ করছে। ঘটনাটার কথা যখনই আমার মনে হয় তখনই একটা বেদনা এসে মর্মপীড়া জন্মায়। ছেলেবেলায় প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ পড়ে যে ধারণা হয়েছিল এ কয় বছরের

রাজনৈতিক ও সামরিক নাটকগুলিও সেইরকম রেখাপাত করে : একটি পংক্তিও মুখস্ত বলতে পারি নে। কিন্তু এই ঘটনাটি একটা নিদারুণ ধিক্কারে আত্মশুদ্ধির আগ্রহ জন্মিয়ে দেয় ; আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সাহসকে সঞ্জীবিত ক'রে তা আমার দৃষ্টির সম্মুখে ভাস্বর হয়ে আছে। যে দিন এই ঘটনাটি ঘটে সে দিন যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একে বিশ্লেষণ করেছিলাম, আজও ঠিক তেমনি করে থাকি।

বাতাসের ঢেউ

নদীর ধারে গোলাবাড়ীর উপরে ডুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি ধীরে মিলিয়ে যায়। নদীতীরের কাছে সেজ গাছের যে পাতাগুলি রোদে ঝলসে গিয়েছিল তারা আবার আস্তে আস্তে সজীব হয়ে ঝির ঝির করে। এখানে ওখানে গাছের তলায় মশার ঝাঁক নৃত্য শুরু করেছে। নদীর তীরের খড়ো ঘরগুলোর চিমনি দিয়ে এতক্ষণ যে কালো ধোঁয়া উঠছিল সেগুলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা বাড়ীর সদর দরজায় জলছড়া দিয়ে ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলি সরিয়ে নাড়িয়ে যথাস্থানে রাখে। নৈশভোজনের সময় হয়েছে।

বয়স্কেরা টুলের উপর বসে বড় বড় তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে আর বকর বকর বকে চলে। ছেলেরা চঞ্চল হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, না হয় সেজ গাছের তলায় বসে ঘুটিং খেলে। মেয়েরা বাটি ভরে নুনশাক ও হলদে ভাত নিয়ে আসে, সেগুলো এত গরম যে তখনও ধোঁয়া উঠছে। নদীর বুকে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা ভাসছে। সেখানে কোন কবি থাকলে হয় তো বলতেন, আহা, কৃষকদের জীবন কি স্বর্গীয় আনন্দে ভরা!

এরকম মন্তব্য অবশ্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও মিথ্যা, কারণ কবি কোন দিন বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং-এর মুখ থেকে কোন মন্তব্য শোনেনি। বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং তখন খুব চটে ছিল। টুলের পায়ায় তালের পাখাখানি ঠুকতে ঠুকতে সে বলে চলেছে: 'বয়স আমার উনআশী বছর হলো। অনেক দিন তো বাঁচলাম। ছেলে-ছোকরাদের এত অধঃপতন কখনও দেখিনি। এখন আমার মরাই ভাল। মুখের সামনে তাদের খাবার তৈরি, আর তারা বসে বসে ভাজা শিমের বিচি চিবোচ্ছে। এমনি করেই এক একটা সংসার উচ্ছন্নে যায়।'

তার নাতনীর মেয়ে ছয় চিং দু-হাত ভরা ভাজা শিম বিচি নিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। বুড়ীর কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে সে নদীর ধারে নেমে গেল ও একটা সেজ গাছের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে রইল। গালের দুপাশে বেণী দুটো ঝুলিয়ে দুষ্টুমির সঙ্গে গলা বাড়িয়ে সে চীৎকার করতে লাগল, 'ডাইনী বুড়ি, তোমার মরণ হয় না!'

বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং যদিও আসলে কানে কালা নয়, তবু সে তার কথা শুনতে পেল না। আপন মনে গজ্ গজ্ ক'রে বলে যেতে লাগল: 'এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ ক্রমেই যেন বেশী অধঃপাতে যাচ্ছে।'

এ গাঁয়ের একটা বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকটি শিশু জন্মাবার পরেই তাকে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হয়। যার ওজন যত চিং তার নামের সঙ্গে সেই রাশিটি বসানো হয়। বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং পঞ্চাশ বছর বয়স হতেই বকর্ বকর্ শুরু করেছে। সে বলে, তার ছেলেবেলায় আবহাওয়া এত গরম কখনই ছিল না, শুকনো শিমও এত শক্ত ছিল না। পৃথিবীর পরিবর্তনটা খারাপের দিকেই চলেছে। ছয় চিং তার ঠাকুরদাদার বাবার চেয়ে তিন চিং এবং তার বাবার চেয়ে এক চিং কম। এ নিয়ে কোন রকম তর্ক চলে না। 'এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ যেন বেশী খারাপ হয়ে পড়েছে,' বুড়ী ঠাকুমা জোরের সঙ্গেই বলে চলে।

তার নাতী সাত চিং-এর বৌ ইতিমধ্যে এক টুকরি ভাত নিয়ে টেবিলের কাছে এসে উপস্থিত হল। ভাতের টুকরিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে রাগত স্বরে বলে উঠল : 'সব সময়েই ওই এক কথা, না? কিন্তু ছয় চিং জন্মাবার পর ওজনে ছিল ঠিক ছয় চিং আর ছয় ও আধা লিয়াং। তোমাদের দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক নয়, তাতে এক চিং-এ আঠার লিয়াং—যোল নয়, অথচ হওয়া উচিত তা-ই। প্রামাণিক দাঁড়িপাল্লা হলে ওজন হত সাত চিং। জান, পুরানো দাঁড়িপাল্লাটাকেই আমি বেশী বিশ্বাস করি, কেন না, ঠাকুরদাকে ওজন করবার সময় ওজন হয়েছিল চোদ্দ লিয়াং।...'

'এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ ক্রমেই যেন বেশী ক'রে অধঃপাতে যাচ্ছে।'

সাত চিং-এর বৌ একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাত চিং একটা ছোট্ট গলি থেকে বেরিয়ে আসছে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে লক্ষ্য করে বৌ বলে উঠল : 'এই যে জ্যান্ত মড়া, এতক্ষণ

কোথায় ছিলে ? এত দেরীর মানে কি ? সকলে তোমার জন্যে বসে আছি, ভাতগুলো সব জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

সারা জীবন গ্রামে বাস করলেও সাত চিং অনেক দিন আগেই এটা বুঝতে পেরেছিল যে, গ্রামবাসী সকলের চেয়েই সে উঁচু স্তরের লোক। ঠাকুরদার থেকে শুরু করে সে পর্যন্ত তিন পুরুষের কেউ কখনও লাঙল ছোঁয়নি বা নিজের হাতে বীজ বোনেনি। লুচেন থেকে নিকটবর্তী শহরে যে জাহাজ চলাচল করে, তাইতে যাতায়াত করে সারা জীবন কাটিয়েছে। জাহাজখানি খুব ভোরে ছেড়ে আবার সন্ধ্যার মুখেই ফিরে আসে এবং এমনি করেই সওদাগর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছে। একটা কেন্নো মারা পড়লে বা কোন স্ত্রীলোক একটা অদ্ভুত জীব প্রসব করলে সর্বাগ্রে সে-খবরটা সে-ই শুনতে পায়। এসব কারণে সে গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য হয়ে আসছে। সে যাই-হোক, দেশের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রাতের খাওয়াটা আলো জ্বালবার আগেই শেষ করা দরকার। কাজেই বিলম্বে আসার দরুণ তাকে ভর্ৎসনা করা আদৌ অসঙ্গত হয়নি। সাত চিং-এর এক হাতে চার হাত লম্বা মসৃণ একটি বাঁশের নল, তাতে আছে একটি সাদাটে পিতলের কলকে আর একটি হাতির দাঁতের মুখ-নল। মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে এলো। ছয় চিং এতক্ষণ সেজ গাছটার আড়ালে লুকিয়েছিল, এবার সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে টুক করে এসে বাবার পাশে বসে পড়ে জড়িত-স্বরে বলে উঠল, 'বাবা!' বাবা কিন্তু প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল না।

'এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ আরও বেশী অধঃপাতে যাচ্ছে,' বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং আর একবার বলে ওঠে।

সাত চিং মুখ তুলে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'শুনেছ, সম্রাট তাঁর সিংহাসন ফিরে পেয়েছেন।'

খবরটায় সাত চিং-এর বৌ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু সে তো ভালই হলো। তা হলে তো সম্রাট এবার সব কয়েদীকেই ক্ষমা করবেন, কেমন, তাই না?'

সাত চিং আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'কিন্তু আমার বেণীটা যে কেটে ফেলেছি!'

'সম্রাট কি চান যে প্রত্যেককেই বেণী রাখতে হবে?'

'নিশ্চয়।'

'তুমি তা জানলে কেমন করে?' অধীরভাবে বৌ জিজ্ঞাসা করল।

'লক্ষ্মী রেস্টুরেণ্টে সকলেই তাই বললো।'

এবারে সাত চিং-এর বৌ সত্যিসত্যিই ভয় পেয়ে গেল! লক্ষ্মী রেস্টুরেণ্ট স্থানীয় সকল খবরের কেন্দ্রস্থল। সাত চিং-এর টাক মাথাটির দিকে তাকিয়ে বৌয়ের মানসিক উত্তেজনা দমন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। একটা বাটিতে খানিকটা ভাত ঢেলে দিয়ে বাটিটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন তো খেয়ে নাও। মুখ গুমরে বসে থাকলে বেণী গজাবে না।

এদিকে সূর্যের কিরণও অন্তর্ধান করেছে, নদীর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে একটি হিমেল বায়ুপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। বাটিতে কাঠির টুংটাং শব্দ চলতে লাগল। তখন সবার মেরুদণ্ড বয়ে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। সাত চিং-এর বৌ তিন বাটি ভাত শেষ করে হাঁস-ফাঁস করতে লাগল। সেজ গাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে সে লক্ষ্য করল, বৃদ্ধ সাত চাও ছোট্ট সাঁকোটির উপর দিয়ে মন্থরপদে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তার গায়ে একটি লম্বা জোব্বা, তার রং গাঢ় নীল। জোব্বাটি সুতীর।

সাত চাও হচ্ছে 'পুষ্পাবাস' নামক সরাইখানার মালিক, সে অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার ফলে তার মধ্যে এমন একটা চাল এসে পড়েছে যে, তাকে দেখলেই মনে হবে—হয় তো সে একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারী। দশখণ্ডে সমাপ্ত 'তিন সাম্রাজ্য' নামক বইখানি তার আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে সে সেই বইখানা পড়ে। ১৯১১ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর থেকে সে বেণী পাকিয়ে মাথার উপর রেখে আসছে। সে প্রায়ই বলে যে, 'তিন সাম্রাজ্য'-এর অন্যতম নায়ক চাও জে-লুঙ আজ বেঁচে থাকলে পৃথিবীতে এতটা বিশৃঙ্খলা আসা সম্ভব হত না।

সাত চিং-এর বৌয়ের দৃষ্টিশক্তি ছিল অতি প্রখর, সে অনেক দূর থেকেই তাকে দেখতে পেল। দেখল, চাও সাত তার বেণীর প্যাঁচ খুলে ফেলেছে। কালো চকচকে বেণীটি তার পিঠের উপর সুবিন্যস্তভাবে ঝুলে রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সাত চিং-এর বৌয়ের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, সম্রাট সত্যি সত্যিই সিংহাসনে বসে জনসাধারণকে বেণী ঝুলিয়ে চলতে আদেশ করেছেন। কাজেই বেণী সম্পর্কে তার স্বামী এখন বেশ একটু মুশ্‌কিলেই পড়েছে। সাত চাও তার গাঢ় নীল রঙের জোব্বাটি কালে ভদ্রে ব্যবহার করে। গত তিন বছরে দু-বার মাত্র সে এই জামাটি ব্যবহার করেছে: একবার, তার পরম শত্রু বসন্ত দাগামুখ আ-ৎজু যখন পীড়িত হয়, আর একবার যখন বুড়ো লু মারা যায়। বুড়ো লু একবার তার সরাইখানা তছনচ্‌ ক'রে দিয়েছিল। কাজেই সে যে জয়ের আনন্দই উপভোগ করছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সাত চিং-এর বৌয়ের আর একটা কথাও মনে পড়ল। বছর দুই আগে সাত চিং মদ খেয়ে একদিন মাতাল হয়ে সাত চাওকে গালাগালি দিয়েছিল পুরোনো জিনিসের ফেরিওআলা বলে।

সাত চাও যখন এল তখন প্রতিবেশীরা সকলেই খাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের ভাতের বাটি ও কাঠি দেখিয়ে সমস্বরে বলে উঠল : 'সপ্তম কর্তা, দয়া করে আমাদের সঙ্গে দুটো খেয়ে যান।' কিন্তু সে তাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—'চিন্ চিন্'। সাত চিং-এর পরিজনেরা যেখানে বসে খাচ্ছিল সেখানে গিয়ে সে থামল। তারাও সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে খাওয়ার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। সে আগের মতই 'চিন্ চিন্' বলে বাঁকা চাউনিতে তাদের খাবারের দিকে তাকাল।

'বাঃ, শুকনো সবজিগুলো তো বেশ রসালো মনে হচ্ছে। ... ভালো কথা, খবর শুনেছ?' সাত চিং-এর পিছনে দাঁড়িয়ে তার বৌয়ের দিকে মুখ করে সে কথাটা বলল।

'হাঁ শুনেছি, সম্রাট নাকি সিংহাসনে বসেছেন,' সাত চিং বোকার মত কথাটা বলল।

সাত চিং-এর বৌ সাত চাওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

'হ্যাঁ,' সে বলল, 'আমিও শুনেছি যে সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। আমার মনে হচ্ছে, এবার কয়েদীরা সকলেই ছাড়া পাবে।'

'হাঁ, আজ হোক, কাল হোক, সকলকেই ক্ষমা করবেন,' সাত চাও অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল। 'কিন্তু সাত চিং, তোমার বেণীটি কি হল? ওটা নেহাৎ ফেলনা জিনিস নয়। তাই-পিঙ বিদ্রোহের কথা মনে আছে তো? যারা মাথার চুল বাঁচিয়ে ছিল তারা মাথা বাঁচাতে পারেনি, আর যারা মাথা বাঁচিয়েছে তারা চুল বাঁচাতে পারে নি। ...'

সাত চিং ও তার বৌ লেখাপড়া জানে না, কাজেই পুরানো কাহিনীর মানে কেউ তারা বুঝতে পারল না। কিন্তু তারা এটা জানত যে সাত চাও

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তার কথা সব সময়ই সত্যি হয় এবং তারা আরও জানত যে, অবস্থাটা সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নির্বাক হয়ে রইল, যেন এইমাত্র তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে অথবা কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়েছে।

'এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ ক্রমেই বেশী ক'রে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে ...' বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং গজর গজর করছিল, এবারে সাত চাওকে বলবার সুযোগ পেল। 'আজকালকার বিদ্রোহীদের চালচলন সবই অদ্ভুত—তারা লোকের মাথার চুল কেটে সকলকেই নেড়া সন্ন্যেসী বানাতে চায়। সোত্তর বছর তো বাঁচলাম। অনেক দিন হয়ে গেল। তখনকার দিনে রাজকুমারেরা হলদে ও লাল সিল্ক ব্যবহার করত। ... অনেক দিন বাঁচলাম—উনআশী বছর তো হয়ে গেল ...'

সাত চাও মাথা নাড়ল। 'গভীর পরিতাপের বিষয়,' সে বলল। 'মাথায় বেণী না রাখা নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক অপরাধ। শাস্ত্রে প্রাঞ্জল করে এ-কথা লেখা আছে, পরিবারের কেউ নামকরা রাজপ্রতিনিধি থাকলেও বেণী না থাকাটা মহা অপরাধ বলেই গণ্য।'

এ সব কিছু যে বইয়ে লেখাই আছে, এ কথা জানতে পেরে সাত চিং-এর বৌয়ের শেষ আশাটুকুও নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। তার মনে হল, সে যেন একটা সরু কাণাগলিতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে, সেখান থেকে স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব। সাত চিং-এর নাকের ডগায় ভাত খাওয়ার কাঠিটা ছুঁইয়ে বলল, 'শুনছ জ্যান্ত মড়া, যেমন কাজ করেছ এখন তার ফলভোগ কর। বিপ্লব শুরু হতেই কি আমি বলিনি যে, শহরে গিয়ে কাজ নেই? কিন্তু সেদিন আমার কথা শোননি। কত ওজুহাত দেখিয়েই না শহরে গেলে। সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তারা জোর করে ধরে তোমার বেণী কেটে দিল—কেমন

সুন্দর কালো কুচ্‌কুচে বেণীটি ছিল। তুমি একটি জ্যান্ত মড়া, যেমন কাজ করেছ এখন তার ফলভোগ করতে হবে বই-কি।...'

সাত চাওকে গ্রামে ঢুকতে দেখে গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সাত চিং তার পরিজনদের নিয়ে যেখানে বসে খাচ্ছিল সেখানে এসে একে একে উপস্থিত হল। সাত চিং নিজেকে ভদ্রলোক বলেই মনে করে, এখন এতগুলো লোকের সামনে বৌয়ের কথায় সে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। কিন্তু নিজের অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে চেষ্টা করে কাটিয়ে দেওয়ার মতলবে সে শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল :

'আজ এ-কথা বলছ বটে কিন্তু সেদিন কিন্তু ...'

'তুমি একটি জ্যান্ত মড়া!'

সমাগত প্রতিবেশীদের মধ্যে আট একের বৌয়ের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য সবচেয়ে বেশী। দু-বছর বয়সের ছেলেকে কোলে নিয়ে সে সাত চিং-এর বৌয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ঝগড়া উপভোগ করছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্যে দুঃখিতও হচ্ছে। সাত চিং-এর বৌকে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, 'দিদি, রাগ করো না। মানুষ দেবতা নয়। অদৃষ্টে কি আছে কে বলতে পারে? আমার কিন্তু মনে পড়ে, তুমি তখন বলেছিলে যে, বেণীহীন লোককে বেণীওআলাদের চেয়ে খারাপ দেখায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথাও ভুললে চলবে না যে, মেয়র কিন্তু এ সম্পর্কে আজো কোন রকম ঘোষণা করেন নি। ...'

এসব কথা শোনা সাত চিং-এর বৌয়ের বরদাস্ত হল না। হাতের খাওয়ার কাঠিটা আট একের বৌয়ের নাকের ডগায় ঘুরিয়ে সে বলল : 'কি যে বলছিস, তা-ই তুই জানিস নে। আমার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুটা আছে বলেই মনে করি। এরকম অসম্ভব কথা কি আমি কখনও বলতে পারি? আমার মনে আছে, তিন তিনটা দিন আমি শুধু কেঁদে কাটিয়েছি,

সকলেই দেখেছে ... এমন কি, ওই বদমাস ছয় চিংও কম কাঁদে নি। ...' ছয় চিং ইতিমধ্যে বড় এক বাটি ভাত শেষ করে আরও নেবার জন্যে বাটিটা এগিয়ে ধরেছে। এ দেখে সাত চিং-এর বৌ হাতের কাঠি দুটো দিয়ে মেয়ের মাথায় এক বাড়ি বসিয়ে দিল। 'চুপ কর্!' কর্কশ কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, 'বলি, যে বিধবা মেয়েমানুষের চরিত্রের ঠিক নেই, তার কথা কে শুনবে, এ্যাঁ?'

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের ধমকে ছয় চিং-এর হাতের খালি বাটিটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গিয়ে কাণার একটা বড় অংশ দু-ভাগে ভেঙে গেল। সাত চিং লাফ দিয়ে উঠে ভাঙা বাটিটা কুড়িয়ে নিয়ে জোড় লাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। 'তেরি ...' বলে ছয় চিং-এর গালে একটি চড় কষিয়ে দিল। মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করে দিল। বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং নিজের মাথা নেড়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল। সারাক্ষণ কিন্তু সে আপন মনেই বিড় বিড় করে চলল: 'এক পুরুষ আর এক পুরুষ থেকে খারাপ। ...'

আট এক-এর বৌ ক্ষেপে গিয়ে সাত চিং-এর বৌকে লক্ষ্য করে চেঁচাতে শুরু করল: 'তুই কি মানুষ? মিথ্যেবাদী হিংসুটে কোথাকার। তোর মত পাজী মেয়েমানুষের মুখেই অমন কথা সাজে!'

এতক্ষণ সাত চাও নীরব দর্শক হিসাবেই দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু মেয়ের আজও কোন ঘোষণা করেনি—এই মন্তব্য তার মনে পড়তেই সে আবার চাপা-পড়া সে প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু করল। সে বলল: 'জান, রাজার সৈন্য বাহিনী, আজ হোক, কাল হোক, শিগ্‌গির এ-পথ দিয়ে যাবে। তার সেই দলের নায়ক হচ্ছেন জেনারেল চ্যাং। ইনি তিন সাম্রাজ্য-এ বর্ণিত বাঘা সেনাপতিদের অন্যতম চ্যাং ই-তের বংশধর। তাঁর বার হাত লম্বা একটা সাপের মত বর্শা আছে। যে-লোক দশ হাজার সৈন্যের

এক বাহিনীকে, প্রতিরোধ করতে পারে, সেও এই বর্শার সামনে তিষ্ঠোতে পারবে না। ...' কথা বলতে বলতে সাত চাও সারাক্ষণ দু-হাত এমন দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছিল, যেন সে সাপের মত লিকলিকে বর্শাটাই ধরে আছে। তারপর কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গিয়ে আট এক-এর বৌকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, 'পারবে তাকে আটকাতে?'

আট এক-এর বৌ ছেলে নিয়ে রাগে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সাত চাওকে দেখেই তার আতঙ্ক হয়েছিল। সাত চাও যখন আট এক-এর বৌয়ের দিকে এগিয়ে গেল তখন তার মুখখানা ঘামে ভিজে গিয়ে যেন ঝুলে পড়েছে। সে চলে যেতেই সাত চাও তাকে অনুসরণ করল। তাদের দু-জনকে পথ করে দেওয়ার জন্যে সকলেই একটু সরে দাঁড়াল এবং খামাকা পরের ব্যাপারে মন্তব্য করায় সকলেই তাকে দোষারোপ করতে লাগল। 'আচ্ছা, এরকম লোককে তোমরা ঠেকাতে পারবে?' সাত চাও পুলের কাছে গিয়ে পৌঁছেও আট এক-এর বৌকে আর একবার কথাটা বলে শোনালো। সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা লম্বা পা ফেলে মাথা উঁচু করে সে চলে গেল।

গ্রামবাসীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে কি হল, তারা বার বার বুঝবার চেষ্টা করল এবং সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, চ্যাং ই-তে'কে কেউ ঠেকাতে পারবে না, সুতরাং সাত চিং-এর মাথা বাঁচাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাদের মনে পড়ল, আগে আগে শহর থেকে এক একটা খবর এনে সাত চিং লম্বা নলটা মুখে তুলে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাদের কাছে কেমন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত। আর এখন সে নিজেই রাজার হুকুম অমান্য করে বসেছে, কাজেই ভেতরে ভেতরে তারা প্রত্যেকেই খুশি হল। তাদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট বিরক্তি ও ফিস ফিসানি শুরু হয়ে গেল। এর সঙ্গে এসে আবার জুটল মশার

একঘেয়ে ভ্যান ভ্যানানি। মশককুল তাদের খোলা বুকের উপর নৃত্য শুরু করে দিল এবং পরক্ষণেই সেজ গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। একে একে তারা ছড়িয়ে পড়ল, বাড়ী গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। সাত চিং-এর বৌ ঘরের টেবিল-পত্র সব গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু সেও আপন মনে অস্পষ্ট স্বরে গজর গজর করতে লাগল। শেষে সে দরজা বন্ধ করে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

সাত চিং ভাঙা বাটিটা নিয়ে ফিরে এসে চৌকাঠের উপর বসে পড়ল। অবসাদে সে এত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল যে, ধূমপান করতেও ভুলে গেল, ফলে কল্‌কের আগুনও নিভে গেল। অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা তার মনটাকে পেয়ে বসেছে। এ বিপদের হাত থেকে নিস্কৃতির কোনো উপায়ই সে দেখতে পেল না। আপন মনেই সে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল কিন্তু সব কিছুই এমনি ভাবে তালগোল পাকিয়ে গেল যে, সে কোন সঠিক মীমাংসায় এসে পৌঁছতে পারল না। বেণীর সমস্যাই হল আসল সমস্যা। ... সাপের মত বর্শা, বার হাত লম্বা।... এক পুরুষ, আর এক পুরুষের চেয়ে খারাপ। ... আর সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ... এবং ভাঙা বাটিটা শহরে নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে আনতে হবে। ... এ রকম লোককে কে ঠেকাতে পারবে ?... সব কিছুই বইয়ে লেখা আছে। ... 'তেরি—!'

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি সাত চিং শহরে চলে গেল। জাহাজখানা যতক্ষণ না শহরে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণ সে নল হাতে নিয়েই চলল এবং সন্ধ্যার দিকে যখন বাড়ী ফিরে এল, তখনও তার হাতে সেই চার হাত লম্বা বাঁশের নলটি রয়েছে। তা ছাড়া, মেরামত-করা ভাঙা বাটিটিও আছে। কেমন করে সেটি মেরামত করা হল, খেতে খেতে বুড়ী ঠাকুমা নয় চিংকে আগা-

গোড়া তার সব কিছু খবর দিল। বাটিটি মেরামত করতে ষোলটি পিতলের পেরেক লেগেছে।

প্রতিটি পেরেকের দাম তিন পয়সা, কাজেই সবশুদ্ধ খরচ পড়েছে বার আনা।

বুড়ী ঠাকুমা নয় চিং এত খরচ হওয়ায় আপত্তি জানাল।

'প্রত্যেকটি পুরুষ আগের পুরুষের চেয়ে খারাপ,' বুড়ী বলল। 'অনেক দিন তো বেঁচে আছি, একটা পেরেকের দাম তিন পয়সা! কোন কালে এমন কথা শুনিনি। আগের দিনে এক একটা পেরেকের দাম ছিল ... উনআশী বছর তো বাঁচলাম!'

সাত চিং তখনও প্রতিদিন নিয়মিত শহরে যায় কিন্তু তার বাড়ীর আবহাওয়াটা ক্রমশই করুণ হয়ে উঠল। গ্রামবাসীরা সকলেই যেন তাকে পরিত্যাগ করেছে এবং তার কাছে শহরের খবর শোনবার আগ্রহ তাদের ক্রমেই যেন কমে এল। তার বৌ তখনও তাকে কথায় কথায় 'জ্যান্ত মড়া' বলে চলেছে।

দশ দিন পরের কথা, সাত চিং শহর থেকে ফিরেছে, বৌ অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তার সঙ্গে তার দিকে তাকাল।

'কোন খবর পেলে?' বৌ জিজ্ঞাসা করল।

'না, কিছুই না।'

'সম্রাট কি সত্যি সত্যিই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন?'

'কেউ তো কিছু বলল না।'

'লক্ষ্মী রেষ্টুরেণ্টেও কেউ কিছু বলেনি?'

'না।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, সম্রাট মোটেই সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। আজ আমি সাত চাও-এর সরাইখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম,

দেখলাম সাত চাও বসে বসে বই পড়ছে। তার বেণীটি মাথার উপর পাকিয়ে রেখেছে, তার উপর সে জোব্বাটিও পরেনি।'

'আচ্ছা ...'

'আমার মনে হয়, সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেননি।'

'তা হতে পারে।'

তখন থেকে সাত চিং আবার তার পূর্ব সম্মান ফিরে পেল। আবার তার বৌ ও গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে সাধুবাদ দিতে লাগল। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে পরিবারের সকলে মিলে খামার-বাড়ীর উঠানে বসে সন্ধ্যা বেলা খাওয়া-দাওয়া করতে লাগল। প্রতি-বেশীরাও হাসি মুখে তাদের কাছে আসতে ভুলল না। বুড়ী ঠাকুমা নয় চিংও তার অশীতিতম জন্মোৎসব শেষ করল, তার স্বাস্থ্য তখনও বেশ অটুট, তবে এখনও তার সে বকর বকর অব্যাহত আছে। ছয় চিং-এর ছটো বেণী এখন একটি বেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তার পা ছটি নতুন করে বেঁধে দিলেও সে তার মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করে। সময় সময় দেখা যায়, সে উঠানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে, হাতে রয়েছে তার সেই ষোলটি পিতলের পেরেক মারা ভাতের বাটিটি।

শত্রুর কবল থেকে গরু বাছুর সব উদ্ধার করতে হবে (চীন উডকাট) ঃ শিল্পী—উ চা

বন্যা

পাশের গ্রাম থেকে যে সকল কুটুম এসেছে তারা বাড়ীর সকলের কাছে বসে কি সব বলাবলি করছে, আর সকলে মিলে গভীর আগ্রহে মন দিয়ে শুনছে। দেখতে দেখতে ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল, খড়ের চালের উপর চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে। পাঁচ বছরের লাও ইয়াও মায়ের কোলে বসে ছিল। সম্প্রতি তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেও আর-সকলের মতই তার ছোট দুটি কান খাড়া করে আছে। কেন শুনছে, সে তা জানে না। কি শুনতে চায় তাও তার জানা নেই,

কিন্তু তবুও এই মুহূর্তে শোনা ছাড়া যে আর কিছুই করণীয় নেই, সেটা তার কাছেও সুস্পষ্ট।

অদূরেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। অনিশ্চিতভাবে বাতাসের মর্মরধ্বনি শোনা গেল। সম্ভবত ওই সোঁ সোঁ শব্দই বাতাসের সাহায্যে গাছের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। ...

'ওই শোন! কিছু কি শুনতে পাচ্ছ না? চুপ করে শোন!'

দূরে যেন কারুর অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শোনা গেল।

'হয় তো কে ওখানে চেঁচাচ্ছে।'

'দূর্ বোকা! আমি ত কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে।'

'আচ্ছা, দাঁড়াও, নিশ্চয়ই গলার স্বর!'

খানিকক্ষণ কেউ কিছু বলল না। তার পর এল বিশ্রামের ক্ষণ। বুড়ী ঠাকুমার সারা মাথা জুড়ে একটি টাক, অর্ধেক কথাই সে শুনতে পায় না! হঠাৎ কি মনে করে ফোকলা দাঁতে বিড়্ বিড়্ করতে শুরু করল ঃ

'স্বর্গীয় বাপ ঠাকুর্দা, বলতে পার এখন আমি কি করি! গণকঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, এবছরটায় আমার বড় বিপদ। ... মনে কিন্তু হয় যে বান এ পর্যন্ত ধাওয়া করবে না, সব সময়েই দেখে এসেছি, কোন না কোন উপায়ে আমি বেঁচে গেছি। ভেবে দেখো, সারাটা জীবনভর কত বিপদ-আপদহে না পড়েছি! অবশ্য, কেউ নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না ... কিন্তু, মনে ভেবো না যে, মরতে আমি ভয় পাই। আমার এখন যাওয়ারই সময়, তবে কি না, ছেলে মেয়ে, নাতি-নাতনীদের ফেলে যাওয়া—সে বড় কষ্টকর।'

'ছেলেই বল, আর নাতিই বল, অদৃষ্ট কাউকেই রেয়াৎ করে

না! সকলকেই সমান ভাবে নেয়, আর এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখের।'

'কেন, তুমি না পিতৃহীন ছেলে! চুপ কর! মনে রেখো, উনি শুনতে পাবেন!'

'ওকে এখন শুইয়ে দেওয়া উচিত। এই দিদি, ঠাক্‌মাকে শুইয়ে দাও। এতটা পথ হেঁটে এসে উনি নিশ্চয়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।'

'বিছানা হয়েছে। শুনছ ঠাক্‌মা, তোমার শোয়ার সময় হয়েছে।' দিদি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

'দূর্! আমি এখন শুবো না। ওরা আগে ঘরে ফিরুক, তবে না শোয়া। ওরা কখন ফিরবে বলতে পার?'

'কে বলতে পারে? তারা এখন কোথায়, তাও আমরা জানি নে। সাড়া শব্দও পাচ্ছি নে এখন আর! আজ রাতেই কিছু হবে বলে মনে কর কি?'

'কেমন করে বলব? স্বয়ং বুদ্ধদেবও সে কথা বলতে পারবেন না!'

'বুদ্ধ! চুলোয় যাক তোমার বুদ্ধ! আমাদের সঙ্গে তার কি শত্রুতা আছে? বান, বান, বান, তবুও সেই বছরের পর বছর আমরা সেই বুদ্ধকে নিয়েই পড়ে আছি! শয়তান! আমাদের এখন সকলে মিলে তোমার ওই বুদ্ধকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই উচিত। কেন আমরা বাঁধ মেরামত করব? সারারাত ধরে পাহারাই বা দেবো কেন? রক্তের বন্যা বয়ে যাক! আর সেই বন্যায় ভেসে যাক ওই তোমাদের বুদ্ধ! আমি বলছি, আমাদের ওই শত্রুকে আগে নিপাত কর!'

'চুপ কর, তা-ফু। যে বিগ্রহ তোমাকে দেখতে পর্যন্ত পাচ্ছে না তাকে নিয়ে কেন এত উত্তেজিত হচ্ছ?'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু ও যা বলে তাও সবই তো সত্যি। বান, বান, বান—প্রতি বছরই চলেছে!'

'এবারকার বন্যা অন্যান্য বারের চেয়েও সাংঘাতিক হবে। সবুর কর না!'

আর কেউ সে-কথায় কান দিল না। এ সব স্বাস্থ্যবতী চাষী স্ত্রীলোক সাধারণত খুব বেশী কথা বলে না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত ভয়ে আর উত্তেজনায় সকলেই বাচাল হয়ে পড়েছে এবং সকলেই এক সঙ্গে হড়্ হড়্ করে নানা কথা বলতে শুরু করল। যে সব ছেলেকে বাঁধের ধারে যেতে দেওয়া হয়নি তারা পরমোৎসাহে এই বৈঠকে যোগ দিল এবং সবার মাঝখানে বুড়ী ঠাক্‌মা সমান ভাবে আপন মনে গজ্ গজ্ করে বকে চলল :

'কত বছর আগের কথা, সেটা আমার ঠিক মনে নেই—তবে তখন আমি এই লুঙ্ এড়-এর মতই ছোট—তখন আমাদের মাটি, গাছের ছাল সব কিছুই খেতে হয়েছে ; সত্যি। পরিবারের একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে গিয়ে পড়লাম—দেখতে দেখতে বাড়ীর লোকজন ক্রমেই কমতে লাগলো, বাড়ীর অত লোকের মধ্যে অনেকেই মারা গেল—আকাল, মারী, আরও কত সব দুঃখ দেখা দিল, দেশের সর্বত্র মৃতদেহ ছড়ানো! কুকুর দাঁড়কাকের ভোজ লেগে গেল! কত লোক মরল, জানি নে : আমাদের বাড়ীতে প্রথম মরল আমার ছোট ভাইটি, সে মরল মায়ের শুকনো মাই চুষে। তারপর আমার বোন, পিসিমা এবং তারপর কাকা। ... আমার তখন সাত বছর বয়স। কেমন করে জানি নে, আমি বেঁচে রইলাম, আজও আছি। তোমরা কি এসব বিশ্বাস করবে? ভিকিরী হয়েও বেঁচে রইলাম, না খেয়ে অত লোক মরল কিন্তু আমার মরণ হল

না। দাসী আমি, মারধর খেয়েও বেঁচে রইলাম। এখন আমার বয়স ষাট-পঁয়ষট্টিই হবে, তবু সে সব আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। এই লুঙ্-এড়-এর মতই দেখতে ছিলাম, পরনে ছিল ছেঁড়া লেংটি। সেই বারেই জীবনে প্রথম বন্যা দেখলাম। তখন থেকে …’

লুঙ-এড়ের এটা মোটেই ভাল লাগছিল না যে তার সঙ্গে একটা টাক-মাথা বুড়ীর তুলনা হয়। বুড়ীর বেসুরো একঘেয়ে কণ্ঠস্বর ক্রমাগত চলতে লাগলো। কেন যেন ছেলেটার মনে একটা ভয় দেখা দিল। তাই সে সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি ঘরের অপর প্রান্তে তার দাদার কাছে সরে গেল। লাও-ইয়াওর চোখ দুটোই যে আধাবোজা ছিল কেবল তাই নয়, তার ছোট কান দুটোও সে খুলে রাখেনি। ঠাকমা যখন একঘেয়ে বকতে লাগল তখন ওর দৃষ্টি ঘরের প্রত্যেকটি অস্পষ্ট আকৃতির দিকে নড়াচড়া করছিল। সে আবার বুড়ীর দিকে তাকাল; কথা বলতে গিয়ে প্রত্যেক বার বুড়ীর তোবড়ানো গালটা একবার ফুলে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে বসে যায়। তাকে দেখাচ্ছে বড় হাস্যকর, আর তাকে দেখে লাও-ইয়াওর হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারছিল না। তাকে অবশ্য কেউ হাসতে নিষেধ করেনি, তবে আবহাওয়াই যেন তার মনটাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সে হাসতে পারল না।

ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ! গুলির শব্দের মত একটা আওয়াজ হল। শব্দ শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল কোন একটা জিনিসকে লক্ষ্য করে কেউ কিছু ছুঁড়ে মেরেছে—অথবা হয় তো চায়ের বাটি ধাক্কা লেগে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ করল, বুকে দুরদুরানি শুরু হল, দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে একটা নীরবতা নেমে এল। আবার তারা বাতাসের অবিরাম শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেল। আর তখনও ঠাকুমার বকর্ বকর ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে।

'আচ্ছা বল তো এ কার দোষ ? কে বলবে ? স্বামী আমার ছিল ভারী ভাললোক, বিশ্বাসী, নির্ভর করা চলে—আর ছেলেটাও ঠিক তারই মত। তাদের দু-জনের একজনও কোন দিন এতটুকু সময় আলস্যে কাটায় নি ! অথচ কি ভাগ্য আমার, তাদের দু-জনের একজনও আজ বেঁচে নেই। কেন ? এ কেমন ধারা বিচার ? স্বর্গের দেবতা কোথায় ? আমার কথা—আমার জন্যে আর ভাবিনে—আমি আর কতক্ষণ বাঁচব—বড়জোর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু তোমরা সব ছেলেমানুষ, তোমাদের বেলাতেও কি তাই ঘটবে না ? আমার মনে হয়, তবু তোমরা আশায় বেঁচে আছ, আমিও বয়সকালে অমনি আশাই করেছি। মনে হত, পৃথিবীটা হবে সুন্দর, হবে কল্যাণ্যের ; কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি সবকিছু গুলিয়ে গেছে ! বাজে স্বপ্ন ! আমি বলছি, ভাল হওয়াই বোকামি। ... আমার মৃত্যুর পর কি হবে ? পৃথিবীটা যেমন চলছিল, তেমনি চলবে, সবকিছু একই রকম চলবে—বরং দিন দিনই আরও কঠিন, আরও তেতো হয়ে উঠবে।

'বাজে ! তেতো, তেতো, তেতো—কিন্তু যখন চরম অবস্থায় দাঁড়াবে, তখনই এর শেষ হবে ! কেন—'

বাইরে একটা কুকুর ডেকে উঠল। ঘরের ভিতর একটা তীব্র সুর কেঁপে কেঁপে মাটির দেয়ালে মিলিয়ে গেল। কুয়াসাচ্ছন্ন ফ্যাকাশে রাত্রির আঁধারে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল পুকুর ধারের দারুচিনি গাছটার কাছে ! এখন দরজার ভিতর দিয়েই সেই ছায়ামূর্তিকে স্পষ্ট দেখা গেল, একটি মানুষ। কুকুরটাকে নিজের গলার আওয়াজে সাড়া দিয়ে ঘরে এসে সে ঢুকল।

'এই যে, সান-ইয়ে ! খবর কি সব ? বাঁধের অবস্থা কেমন ? এড়্-কে কেমন আছে ?'

'সারা বাড়ীতে কি একটা আলো নেই ? কোন আলোই নেই ?'

'ব্যাপার কি? তুমি কি মনে কর যে, আমাদের মাথায় আকাশটা ভেঙে পড়বে?'

'এক ফোঁটাও তেল নেই! দুটি মাত্র বাতি আছে—বিগ্রহের সামনে জ্বালাবার জন্যে রাখা হয়েছে।'

'ভাল, খবর কি সব? কারুর যে মুখে রা নেই। বানের জল কি নেমে গেছে, না, এখনও আছে?'

'নেমে যাবে? না এ বান নামবার নয়। বরং আমরাই নেমে গেছি। কি, তুমি কি কাঁসরের শব্দও শুনতে পাওনি নাকি? ত্যাং গ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ওখানটার বাঁধ খুব দুর্বল, আর তা মেরামত করবার সময়ও আর নেই। রোগীর মৃত্যুর পর ওষুধ তৈরির মতই ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে, বুঝলে! অল্পক্ষণের মধ্যেই ত্যাং গ্রাম গভীর জলে তলিয়ে যাবে। একটুখানি সবুর কর, দেখতে পাবে!'

'এখানকার খবর কি?'

'হ্যাঁ, এখানকার বাঁধের কথা? যখন চলে আসি, আমাদের শূয়োরগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কাল সকালে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসতে পারবো কি না কে জানে?'

'বলা কঠিন। বান যদি ত্যাং গ্রাম পর্যন্ত যায় তা হলে এখানে নিরাপদ হওয়ারই কথা। কিন্তু তাদের যতটা জমি আছে, এখানে আমাদের ততটা নেই। আর যদি এখানে বান আসে, তা হলে আমাদের ত্যাং গ্রামে সরতে হবে। মনে হয়, তারা আমাদের যাওয়ায় বাধা দিয়ে আমাদের মরণের মুখে ঠেলে দেবে না, দেবে কি বলতে চাও? সে যাক গে, এখন তা-ফু, এড়্-ফু—তোমরা সকলেই চলে এসো। আরো লোক চাই। সব কিছুর দিকে নজর রাখো। বাঁধে সামান্য ফাটল ধরলেও আমাদের আর রক্ষা নেই।' দরজার দিকে এগিয়ে

গিয়ে সে মলিন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সমুন্নত বক্ষ ও গ্রন্থিল মাংসপেশী নিয়ে লোকটির বিরাট আকৃতি। মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না। ভেবে আর কি করবে। তার চেয়ে বরং সকলে মিলে চলো। হ্যাঁ, তা-মাও, তুমিও এসো, আর তুমি—এড়্-মাও, তুমিও এসো। ছেলেছোকরাদের নজরে ধার আছে, কিছুই এড়ায় না! লা-ইয়াওকে আসতে হবে না, তার শরীরটা হয় তো ভাল নেই।'

ছেলেরা সকলেই বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষত মেয়েদের ওই সব আলাপ আলোচনার হাত থেকে সরে পড়বার সুযোগ পেয়ে তারা বরং খুশিই হল, আর তা ছাড়া, সরেজমিনে দাঁড়িয়ে থেকে বান আসতে দেখা কম কথা নয়। তারা জামা-কাপড়ের জন্যে তাড়াতাড়ি করতে লাগল। গ্রীষ্মকাল হলেও রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডা, কাজেই খালি গায়ে বাইরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

'আচ্ছা, বান দেখতে কেমন? নিজের চোখে না-দেখাতক্ নিশ্চিন্ত হতে পারি নে।'

'কিন্তু দেখতে যখন পাবে তখন আর খাতিরজমায় বসে থাকতে পারবে না! অন্তহীন জলরাশি ছাড়া আর ওটা কিছু নয়—আসবে শোঁ শোঁ করে গজরাতে গজরাতে। শেষ রাত্রে যদি তুমি সে গর্জন শুনতে পাও, আর যদি তুমি ভয়ে মরে না যাও তো আমি কচ্ছপের বাচ্চা!'

নির্ভীক শক্তিমান সান-ইয়ে, যে স্বর্গমর্ত্যের দেবতাদের উপেক্ষা করে এসেছে তার মুখে ভয়ের লেশমাত্র দেখতে পেলে সাধারণত ভীরু স্ত্রীলোকদের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

'ক'টা বেজেছে? তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। আজ আমি কিছুতে

পিছনে পড়ে থাকতে পারি নে; বাড়ীময় ভূতের রাজ্যি। সত্যি আমার ভয় হচ্ছে। আমিও সঙ্গে যেতে চাই।'

'দুর্ বোকা! তুই গিয়ে কি করবি? বাড়ীতে থেকে লুঙ-এড়্ ও চু-চুকে দেখ্। এখানে যদি ভূত থাকে তো বাইরেও ঢের বেশী আছে।'

সান-মু আর বেশী কিছু বলল না, আস্তে আস্তে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

তা-ফু ও আর সকলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। চার দিকে ইতস্তত মেঘখণ্ড জমে আছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটি করে তারা উঠেছে। দেখতে দেখতে তারা কুকুর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে গেল। দারুচিনি গাছটার ওপাশে রাত্রির মলিন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ঘরের ভেতরে যারা আছে তাদের মনে হল, তারা যেন পরিত্যক্ত, বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বেঞ্চের যেখানটায় তা-ফু বসেছিল সেখানকার গরম জায়গাটায় লুঙ-এড়্ হাত ঘষতে লাগল। বাবার জন্যে কেঁদে উঠবে কি না একবার ভাবলে; তারপর মনে হল, দাদার পিছনে ছুটে যাওয়াই বোধ করি উচিত হবে। কিন্তু দুটোর কোনটা করতেই সে মনস্থির করতে পারল না। বাঁধের দিকে তাদের মিলিয়ে যেতে দেখেছে, আর সে এটাও জানে যে, বাঁধ হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড তামাসা। দিনের বেলায় সেখানে সে গিয়েছিল এবং হলদে জলের যে মনোরম ঘূর্ণি দেখেছে, তার সঙ্গে ভেসে চলেছে চেয়ার, বাক্স, টেবিল, বিছানা, সুন্দর তৈজস, জ্যান্ত মুরগী, কুকুর, এমন কি, মানুষও গাছের গুঁড়ির

উপর বসে বা ঢেউয়ের ফাঁকে নিস্পন্দ ভেসে চলেছে! দৃশ্যটা এমন যে ছেলেমানুষ লুঙ-এড় ভাত খাওয়ার কথাও একেবারে ভুলে গেছল। সে কেবল বসে বসে নদীর সেই জলোচ্ছাস দেখেছে লাগল। কিন্তু রাত্রির বেলা সেটা ওকে তেমন আকৃষ্ট করবে না বলেই মনে হয়। বিশেষ করে, এই মুহূর্তে সেই আঁধারে জলস্রোত সম্বন্ধে তার মনে কোন রকম ভাল ধারণা আছে বলে মনে হল না। যে সব জিনিস স্রোতে ভেসে চলেছিল, সেগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। জিনিসগুলো ভেসে চলেছে, ক্রমাগত একটার পর একটা। বুড়ী ঠাকৃমা আবার শুরু করল ঃ

'জানি, আমি বলছি জানি। বড়লোকেরা বানের ভয় করে না। যত ভয় আমাদের মত গরীব মানুষের, কারণ বানে কেবল আমাদেরই ক্ষতি হয়—আমাদের শূয়োর কুকুর সব ভেসে যায় —। একটা বানের কথা মনে পড়ে, তখন আমি ছিলাম চ্যাংদের বাড়ীতে দাসী। ওঃ, দেশে তখন কত ভিকিরী ছিল! গুণে শেষ করতে পারিনি, তারা অবশ্য সত্যিকারের ভিকিরী নয়, বুঝলে? বানে সবকিছু হারিয়ে ভিকিরী হয়ে পড়েছিল। আর চ্যাংদের কি হল? লোকে বলে মুনিবদের ছেলেরা সব উঁচু বাড়ীর ছাদে উঠে মনের আনন্দে সেই বান দেখেছে আর মদ খেয়ে ফুর্তি করেছে। সত্যি বলতে কি, বুড়ো কর্তা সেই বছরই দেশের সব ধান মজুত করে। ছ-সাত গুণ দামে বিক্রি করে অগাধ টাকা করে। এ কথা বিশ্বাস করতে পার? বড়লোকদের অন্তরে এতটুকু মায়া দয়া নেই। এমন কি, স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে তাদেরই পক্ষ নেয়—একথাটাও বুঝতে শুরু করেছি। এত বছর ধরে আমি তাঁর করুণা ভিক্ষা করে আসছি, কিন্তু এক বারও এতটুকু দয়া আমি পেলাম না,

বরং চ্যাংরাই দিন দিন ধনবান হয়ে উঠছে। অবশ্য তাদের এত ধনদৌলত আছে যে তারা তাঁকে অনায়াসেই গৃহবেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে, কিন্তু আমাদের বেলায় সবকিছুই আলাদা। ...'

একটা ইঁদুর ঘরের এদিক থেকে ছুটে পালাল, জিনিসপত্রের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে একটু শব্দ হল।

'বান আসেনি বটে, তবে এর মধ্যেই ওরা টের পেয়ে গেছে দেখছি। কি আশ্চর্য, ছোট ছোট প্রাণীগুলির বিপদ-আপদ বুঝবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা!... সত্যি অমঙ্গল দেখা দিয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস কর আর না-ই কর, একটা কিছু ওলট-পালট হবেই। এক সময় ছিল—'

গল্প-দিদি তা-নিয়াঙ্‌ এ সময় আপনা থেকেই একটা কাহিনীর খেই ধরে বলতে শুরু করল। এ কাহিনীর খানিকটা তার শোনা আর খানিকটা বানিয়ে বানিয়ে বলে চলল। ছেলেপিলেরাই শুধু তার কথা শুনতে লাগল। স্ত্রীলোকেরা সকলেই এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, গল্প শোনায় আদৌ মন দিতে পারছে না। কিন্তু এরাই আবার গল্প-শোনায় মেতে ওঠে। কিন্তু গল্প-দিদি বেশীক্ষণ চালালো না, একটু বাদেই বন্ধ করে দিল। ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টাট্‌কা জল ও ভিজা মাটির গন্ধে ঘরখানা ভরে গেল; সেই সঙ্গে ভেসে এল মানুষের অস্পষ্ট কোলাহল। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল যে, যারা বানের সঙ্গে লড়াই করছে তাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে মশালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে; সেই আলোতে তারা অনেকখানি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। তারা সব ওদেরই লোক। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে, লোকগুলো অসীম সাহসে কঠিন হাতে লড়াই করে চলেছে।

মশালের আলো দেখে মেয়েদের চোখে মুখে ক্ষণেকের জন্যে একটু আশার সঞ্চার হল। সেই আলোর ক্ষীণ রেখা ধীরে ধীরে বাঁধের কোণে গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। তারপর শুধু শোনা গেল একটা কলরব, তাও অল্পক্ষণ পরেই থেমে গেল। মেয়েদের নিস্প্রভ মুখের উপর চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণের জন্য বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন কিছু শোনা গেল না। চোখের সামনে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, সে অন্ধকারও যেন এক গভীর রহস্যে ভরা। একবার শুধু দারুচিনি গাছটার কাছে কুকুর-গুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। তারপর একটি মানুষের মূর্তি এসে সেখানে দাঁড়াল, দেখতে দেখতে দুটি, তিনটি, চারটি মূর্তি দেখা দিল। এদিকে এগিয়ে আসতেই বোঝা গেল যে, দুটি স্ত্রীলোক আর দুটি ছেলে।

'আমাদের দয়া কর। আমরা এসেছি নয়া মাও-তান থেকে, আশ্রয়ের আশায়।'

'নয়া মাও-তান? সেখানটা তো পরশু বানে ভেসে গেছে, তাই না?'

'হাঁ, সত্যি ভেসে গেছে। নয়া মাও-তান এখান থেকে ক্রোশ দশেক হবে।'

'এখানকার চেয়ে অনেক নীচু জায়গা, তাতে সন্দেহ নেই!'

'এসো এসো, ভেতরে এসো! কি হয়েছিল বল তো?'

নয়া মাও-তানের সেই স্ত্রীলোক দুটি ঘরের ভিতরে এল। ক্লান্ত ছেলে দুটো দরজার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

'গেল রাতের আগের রাতে, যেমন ভীষণ আঁধার তেমনি ঝম ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের ঘর-বাড়ী সেই জলে দেখতে দেখতে গলে গেল। কোন জিনিসই ধরে রাখবার ফুরসুৎ পাইনি।

ছোট্ট মাটির ঘর, এত বড় বানের তোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি তার কত টুকু! পড়শীদের অবস্থা আরও শোচনীয়, তাদের শুধু বাড়ীঘরই যায়নি, তারাও ভেসে গেছে। বাড়ী ছেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে একটু দেরী হয়ত হয়েছিল, বোধ হয় জিনিসপত্তর কিছু বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়েছিল ... কাল সকাল থেকে একমুঠো ছাড়া ভাগ্যে আর কিছুই খাওয়া জোটেনি।'

'আহা বেচারীরা! দেখি ঘরে কি আছে—একমুঠো ভাত হয় তো থাকতে পারে।'

'তোমাদের পুরুষেরা কোথায়? কোথায় যাচ্ছ তোমরা? নয়া যাও-তান কি এখনও জলের তলে?'

'পুরুষেরা রয়ে গেছে।'

'তাতে আর লাভ কি? থাকবার জায়গা নেই, খাবার কিচ্ছু নেই, কাজও নেই কিছু—'

'তারা আসতে চায়নি। অবশ্য সেখানে নেই কিছু, ফসল নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু জলের নীচের মাটি এখনও শক্ত আছে। সেই জন্যেই তারা জায়গা ছেড়ে আসবে না।'

'কোথায় যাবে তোমরা?'

'উ ইয়া-শান যাব বলে বেরিয়েছিলাম। সেখানে বোনের শ্বশুরবাড়ী। কিন্তু সকালে খবর পেলাম যে, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ। পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। ভগবান জানেন আমরা কোথায় যাব। আমাদের পুরুষেরা হয় তো এখনও এই কথাই ভাবছে যে, আমরা উ ইয়া-শানেই চলেছি।'

মেয়েটির বয়স অল্প, বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা তার নাই, কাজেই বিপর্যয়ে পড়ে সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

'আমার মনে হয়, আমাদের বাধ্য হয়েই আবার ফিরে যেতে হবে।'

'নয়া মাও-তানে ?'

'তা ছাড়া আর করব কি ? অবিশ্যি যতক্ষণ এখানে নিরাপদ।—'

'এখানেও ভয় আছে! আমাদের লোকেরা সব বাঁধের ধারে পাহারা দিচ্ছে। কে জানে কাল সকালে তুনিয়াটার চেহারা কেমন হবে!'

'হায় ভগবান! আমরা যদি এখানেই আটকে যাই তো আমাদের লোকেরা ভাববে যে আমরা উ ইয়া-শানেই আছি।'

একথা বলতে বলতে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বুড়ী ঠাক্‌মা কানে শোনে না, ওদের দিকে চেয়ে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ সব আবার কি? অবস্থা কি সত্যই খারাপ হয়ে উঠেছে ?'

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। এমন কি, কেউ সেদিকে লক্ষ্যও করল না। সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠল, কি জানি রাত্রির মধ্যে কি হয়!... ঠিক সেই মুহূর্তেই বড় পেটাঘড়িটা বেজে উঠল।

মাঠের যেখানটায় বাঁধ সে দিক থেকেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা ধ্বনি এলো। একটা মিশ্রিত গোলমাল চেঁচামিচি লোকগুলিকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এল, পশুপাখী, মুরগী—সবকিছুই জেগে উঠল। গোটা গ্রামটাই যেন সজীব হয়ে ফেটে পড়ল। জগৎসংসার যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে এবং শব্দের সামান্য ছোঁয়া লাগলেই হয় তো ভেঙে যাবে। একটি স্ত্রীলোক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘর খালি করে বুড়ী ঠাক্‌মা ছাড়া আর সকলেই বেরিয়ে গিয়ে দারুচিনি গাছটার কাছে ভিড় জমাল। চার দিক থেকে উত্তেজিত

জনতার ঠেলাঠেলি, ছেলেমেয়ের কান্না, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, আর সবার উপর ঘণ্টার অবিরাম ধ্বনি। অন্ধকারের বুক চিরে মানুষের আর্ত কণ্ঠ ভেসে এল :

'বাঁধের কাছে যাও সকলে! বাঁধ রক্ষা করতেই হবে! এখন একটি পুরুষও ঘরে থাকতে পাবে না! কেউ প্রাণের ভয়ে পালাবে না! প্রত্যেকেই এসো! আমাদের বাঁধ!'

'কোদাল আনো, মশাল আনো!'

কুকুরগুলো ক্ষেপে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল, মুরগীর আর্ত চীৎকার শোনা গেল, প্রবল বাতাসের বেগে জনতার কোলাহল ও বাঁধের ধারে যারা বন্যার সঙ্গে সংগ্রাম করছে তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর একসঙ্গে মিশে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। নদীর তীরে চারি দিকে মশালের আলো এসে পড়েছে—শত শত লোক পাগলের মত কাজ করে চলেছে।

'ভগবান রক্ষা করো! হে বুদ্ধ, আমাদের বাঁচাও! ওগো ধ্বংসের দেবতা! হে বরুণদেব, এ বন্যা থামাও!'

কে একজন নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা শুরু করে দিল।

গ্রামের লোকেরা পিঁপড়ার মত সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সংখ্যা যত বাড়ে ভয়ও তত বেড়ে যায়। ছেলেগুলি চীৎকার করছে, কুকুরগুলো প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করছে, মেয়েরা সেই বিপর্যয়ে বিব্রত হয়ে চেঁচামিচি শুরু করেছে এবং ঘণ্টা আরও জোরে বাজছে, চারিদিকে মশালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

'বাঁধের দিকে, বাঁধের দিকে ভাইসব!'

'বাঁধ রক্ষা করো! দেশের লোককে রক্ষা করো! আমাদের পরিবারগুলিকে বাঁচাও!'

'দেরী করো না তোমরা, আর সময় নেই ...'

'মশাল ধর, আরও উঁচু করে তুলে ধরো!'

দলে দলে লোক মশাল হাতে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলেছে। নদীর মুখে মাটির বাঁধ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। একদল এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একদল চলে, চারিদিক থেকে লোক চীৎকার ক'রে তাদের উৎসাহিত করে, করুণ আবেদন জানায়। অন্ধকারের বুকে শ্রেণীবদ্ধ মশালগুলি অগ্নিরেখার মত জল্ জল্ করে।

বাতাসের গতি এবার মৃদু হয়ে এলো, বিক্ষুব্ধ জনতার মাথার উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যায়। গাছগুলির আড়ালে চাঁদ হেলে পড়েছে, মাঠ ভরা সবুজ ধানক্ষেতের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে রূপালী আলো।

'সান-মু, যেয়ো না! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কিছু ভেবো না, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছি নে। আমি যাচ্ছি যারা ওখানে কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে।'

'আমিও যাব।'

তারা ঢালু পথ ধরে বিশ্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলল, লম্বা চুলগুলি বাতাসে উড়ছে। তার একটু পরেই আর একদল অন্ধকারের ভিতর গড়াতে গড়াতে চলল। পিছনে ভয়ার্ত শিশু ও জননীদের কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মশালের আলোয় গ্রামের দেয়ালগুলিতে চঞ্চল নারীদের চলমান ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে মূর্তিগুলির সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমে গেল। একে একে মেয়েরাও কোদাল ও শাবল নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। ... কিন্তু জল তবুও বেড়ে চলল।

মাথার উপরে আকাশ শান্ত মূর্তিতে চেয়ে আছে, প্রতিপদের চাঁদ খড়ো ঘরগুলির চালের উপর অবারিত জোৎস্না ধারা ঢেলে দিয়েছে। তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে, তারই ছায়াপথ যেন এই বন্যার ভিতর নেমে এসেছে। ঝির ঝির করে স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে গেল। শীষের ভারে অবনত ধান গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে সে বাতাস আনন্দভরে চুপি চুপি কি যেন বলে গেল।

'গণৎকার বলেছে, এবছরটা আমার দুর্বৎসর,' ঠাক্মা আপন মনেই বিড় বিড় করে উঠল।

রাত্রি

আঙিনায় সবগুলি ভেড়াকেই এনে জড়ো করা হয়েছে। চাওদের আইবুড়ো মেয়েটি তখনও মেটে ঘরের প্রবেশ-মুখে বসে জুতা মেরামত করছে। থেকে থেকে মাথা ঘোরাচ্ছে, তাতে রূপোর ঘুল দু-টি কাঁধে এসে লাগছে, আর জোরে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকবার জন্যে দরজার সামনে ঠেলাঠেলি করায় যারা ধাক্কা খাচ্ছিল তারা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করে দিল।

নির্বাচনী কমিটির সভ্যেরা সকলে এসে থাঙ্-এ জমায়েৎ হয়েছিল, এখন এক জনের পর এক জন জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে

পড়ল। সভার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনও আলোচনা চলছিল। চিঙ বসে বসে জুতো সেলাই করছে, আর এক একবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, তার সে চাউনির মধ্যে ছিল একটি ব্যঙ্গ-মেশানো হাসি।

সভ্যেরা নানা সমস্যার আলোচনা করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল দেরী হয়ে গেছে, চার দিক থেকে রান্নঘরের চিমনির নীল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের অপর প্রান্তে গিয়ে খাওয়া সারবে ঠিক করল, কেন না, পরের দিন তাদের আর একটি নির্বাচনী সভার ব্যবস্থা করতে হবে। উপদেষ্টা এদের সঙ্গে না গিয়ে অভাবনীয় কারণে বাড়ী যেতে বাধ্য হল। তিন চারদিন সে বাড়ী-ছাড়া। বাড়ীর কোন খোঁজই রাখতে পারেনি। তার একটি মাত্র গাই-গরু আছে, সেটি আসন্নপ্রসবা। স্ত্রীর বয়স চল্লিশের উপর, সংসারের রান্না-বান্নার কাজ করে' আর কিছু দেখবার ফুরসুৎ তার হয় না।

বাড়ীর কর্তা বুড়ীকে যাঁতার দিকে ঠেলে দিয়ে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বা রে, খাবার তৈরি, আর তোমরা যে বড় চলে যাচ্ছ ? বৌদের হাতের রান্না কি এতই মিষ্টি ?' এই বলে সে অস্থায়ী হাকিমের একখানি হাত খপ্ করে ধরে ফেলে। হাকিম সম্প্রতি এক সুন্দরী পঞ্চদশীকে বিয়ে করেছে, কাজেই বন্ধুজনের কাছ থেকে তাকে হামেশাই এ রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে হয়।

ঠিক এই সময় চিঙ্ ফটকের কাছে এসে দূর পাহাড়ের ফলভারাবনত কুল গাছগুলির দিকে তাকালে। গায়ে একটি কালো রঙের জ্যাকেট, নানা রকমের তোলা ফুলের নক্সায় সুশোভিত, হাতা লম্বা। ভাঁজের সঙ্গে মানানসই করে গোলাপী উলে বাঁধা। হাত দু-খানি মাথার উপরে দরজার চৌকাঠে ন্যস্ত। বয়স তার ষোল, কিন্তু দেখলে

পরিণত বয়সের বলেই মনে হয়—যেন একটি ফোটা ফুল। বিয়ের বয়স হয়েছে বই-কি।

কমিটির সভ্যেরা পুলের কাছে গিয়ে বিদায় নিল। হো হ্ওয়া মিঙ্ ছাড়া আর সকলেই দক্ষিণ দিকে চলল। সে গেল উত্তরে —তার বাড়ীর দিকে। চিঙ্ তখনও নিঃশব্দে দূরের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখা গেল। হো-র মনে একটা অদ্ভুত ভাব এসে উঁকি মারে। এতক্ষণ সভায় যে-সব সমস্যা তাকে বিব্রত করে তুলেছিল এখন সে-সবকিছুই তার মন থেকে দূরে সরে গেছে, সে যেন কেমন একটু খুশি হয়ে উঠল। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শিস্ দিতে লাগল! তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলে উঠল, মেয়েটা একেবারে গেঁয়ো, অশিক্ষিত, জমিদারের মেয়ে, আগামী শীত-কালে শিক্ষা-প্রচারের কাজেও ওকে রাজী করানো যাবে না। দূর হোক্ গে ছাই! চাও-এর টাকা আছে, তাই বিয়ের বয়স হলেও মেয়ের বিয়ের গরজ তার নেই।

মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলি আন্দোলিত ক'রে দু-হাতে কানের পাশের চুলগুলি ভাল করে পিছনের দিকে গুছিয়ে রাখল—যেন এমনি ক'রেই নিজের মনের সব কিছু গ্লানি ঝেড়ে ফেলল সে। চার দিকে একবার তাকাল। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি পুরু নীল মেঘ যেন ঝুলে আছে, আর সেখানে সোনালী ঢেউ ঝিকিমিকি করছে। রঙের সঙ্গে পাহাড়ের রূপ-রেখা মিলে একাকার হয়ে গেছে। তার মনটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে গেল, অনেক কথাই তার মনে পড়ল। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়ায় তখনও সূর্যের আলো রয়েছে, চাষীরা তখনও লাঙল চালাচ্ছে। কেউ কেউ লাঙল কাঁধে নিয়ে বলদগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরছে। যেদিন থেকে সে চাষ-বাসের উপদেষ্টার

পদে নির্বাচিত হয়েছে সেদিন থেকেই হো হ্‌ওয়া-মিঙ নিজের জমিতে লাঙল দেবার সময় পায়নি। গত বিশ দিন ধরে জেলায় নির্বাচনের হিড়িক চলেছে। ফলে সে এত ব্যস্ত যে, নিয়মিত বাড়ীতেও যেতে পারেনি, আর পাহাড়ে তার যে জমি আছে সেখানেও চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে, যে দু-এক বার বাড়ী এসেছে, তখন শুধু গাল-মন্দই শুনতে হয়েছে।

সত্যি বলতে কি, কাউকে জমি চাষ করতে দেখলেই তার মনে হয়, তার নিজের জমি অনাবাদী পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও তার মনে হল যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সে তার জমির দিকে নজর দেওয়ার সময় পাবে না। কথাটা মনে হতেই একটা অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করল। নিজের চাষ-আবাদের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে তা প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চায়। লোকজনের মাঝে বাড়ী বা চাষের কথা তার মনেও থাকে না। তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও রিপোর্ট তৈরী চলে। এমন কি, কোন এক গ্রামে নির্বাচনী সভা উপলক্ষ্যে নবান্ন নৃত্যের ফরমায়েশও আসে। সুকণ্ঠ বলে সমগ্র জেলায় তার প্রসিদ্ধি থাকায় গানও দু-একটা গাইতে হয়। কিন্তু নিজের জমির চাষ সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করার প্রবৃত্তিও তার হয় না। নির্বাচন শেষ হলেই সে পাহাড়ে যাবে, আবাদ করবে। এর মধ্যেই জমি, মাটির গন্ধ, ঝলোমল সূর্যালোক, গরুর হাম্বা রব—সব কিছুই যেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল, এ সবই যেন তার জীবনের অপরিহার্য অংশ।

উপত্যকার আড়-পারের কাছাকাছি পৌছতেই চার দিক অাঁধারে ছেয়ে গেল, সে জোর পায়ে এগিয়ে চলল। অন্ধকার হলেও বহু দিনের অভ্যাসে পথ চিনে যেতে তার কোন অসুবিধাই হল না। তার কল্পনাও

চলেছে তারই মত দ্রুত। এই গভীর নিস্তব্ধ উপত্যকায় আসতেই তার কত কথাই মনে পড়ল। মনে তার পড়লছেলেবেলাকার এক দিনের কথা। একবার একটা হরিণের পিছু ছুটতে ছুটতে সে গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়ে। সেখানে একটি ছোট্ট বাঘের সঙ্গে তার ভীষণ লড়াই হয়। এরও অনেক বছর পরের কথা, এক দিন একটি ছোট্ট বোচকা কাঁধে নিয়ে সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল বিয়ে করতে। তখন তার বয়স ত্রিশ আর বৌয়ের পঁয়ত্রিশ, কিন্তু তা হলেও ওর মনে বৌয়ের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছিল, আজ এত দিন পরে সে কথা ওর মনেও পড়ে না।

ক' দিন পরে গাধায় চড়ে সে বৌকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। অন্ধকার যতই হোক না কেন, কোথায় ওর এক বছরের ছেলেটিকে আর চার বছরের মেয়েটিকে কবর দিয়েছিল স্পষ্ট করেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাত্র এক বছর আগেও রাত্রিতে বৌকে নিয়ে সে উপত্যকায় বেড়াতে আসত। ওই বড় গাছটার কাছেই না ওৎ পেতে থেকে সৈন্যদলের অধ্যক্ষটিকে হত্যা করা হয়েছিল? তখন ও নিজেও ছিল সৈন্যদলের এক জন। যে দিন থেকে ও উপদেষ্টার পদে নির্বাচিত হয়েছে, সে দিন থেকে প্রায়ই ওর বাড়ী ফিরতে খুব দেরি হয়। অতীতের স্মৃতি তিক্ত-মধুর ও সুতীব্র, তাই ওর কাছে আজ তা মহা সান্ত্বনার বিষয়। মনটা বিশেষ ক্লান্ত, তার উপর নানা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার গুরু দায়িত্বে সে যেন বিভ্রান্ত; যখনই ও এই নির্জন অন্ধকার পথে চলাফেরা করে, তখন ছাড়া এ সব কথা ওর মনে মোটেই জাগে না।

পথের দু-পাশে উঁচু পাহাড়। যতই ও এগিয়ে চলল, ততই গাছ-পালার সংখ্যা বাড়তে লাগল। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে একটি ঝরনা কল-কল শব্দে বয়ে চলেছে। পাহাড়ে ঢাকা পড়ে আকাশ সংকীর্ণ

হতে হতে একটি সরু ফালিতে রূপান্তরিত হয়েছে, দু-একটি সঙ্গিহীন তারা মিট-মিট ক'রে তাকায়, মৃদু দক্ষিণা হাওয়া তার পিঠে এসে লাগছে আর সে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে নাম-না-জানা চেনা চেনা একটা সুগন্ধ। দূরে গ্রাম্য কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছে, দুটি হলদে আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে। তার গ্রামখানি বড় গরীব, হয় তো সারা জেলার মধ্যেই সব চেয়ে গরীব, তবু সে গ্রামখানিকে ভালবাসে। গ্রামপ্রান্তের শুকনো কাঠের স্তূপটি তার নজরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গেই একটি গর্ব ও স্নেহের ভাব তাকে অভিভূত করে দিল। তার গর্বের আরও কারণ এই যে, গ্রামের বিশটি পরিবারের আঠাশটি লোককেই সে তার ঘনিষ্ঠ সাথী বলে গণ্য করে।

একটি মসৃণ প্রশস্ত ঢালের কাছে এসে পৌঁছতেই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। এ কথাটা ভেবে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, এতক্ষণ তার গরুটির কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তার মনে সাগ্রহ প্রশ্ন জাগল: নিরাপদে কি বাচ্চা হয়েছে, না, কোন বিপদ ঘটেছে?

কল্পনায় কতবার সে অনাগত বাছুরটিকে দেখেছে—ঠিক তার মায়ের মত, তবে তার চেয়ে অনেকটা নধর। কিন্তু আজ তার ছায়াটুকুও আর মনে ছিল না। আরও জোর পায়ে সে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল এবং ছুটে গোয়ালের দিকে গেল।

গোয়াল-ঘর থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল, খাঙ * পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বৌ বিছানা পেতে চুলোর পাশে বসে আছে, তার যেন ঘুমোবার কোন মতলব নেই। জিবটাকে সংযত করে সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল। বৌয়ের মুখের প্রতিটি বলি-রেখায় এই

* ঘরে শোবার জায়গা। ঘরের এক পাশে বেদীর উপরে বিছানা পাতা হয়। বেদীর নীচে উনুনে সামান্য আগুন রাখা হয়। লোকজন এলে এখানেই বসতে দেওয়া হয়।

আভাসই পাওয়া যাচ্ছে যে, একটা ঝড় আসন্ন। কাজেই এখন এর হাত থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়—জামা-কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ; তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই সে পেয়েছে। তবে আজ সত্যিই বড় দেরী হয়ে গেছে, আর গরুটা ... হঠাৎ বৌয়ের টাক-মাথাটার দিকে নজর পড়তেই তার মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। ঝগড়ার কোন সুযোগই দেওয়া হবে না স্থির ক'রে সে বৌয়ের দিকে না তাকিয়েই শুয়ে পড়ল। 'আঃ, কি গরম!' কথাটা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ঝগড়ার সুযোগ দিতে সে আদৌ চায় না। সে পরিশ্রান্ত, তাই আশা করেছিল বৌ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে।

এক ফোঁটা কি যেন মাটিতে পড়ল : বৌ কাঁদছে! একটির পর একটি—গাল বেয়ে অঝোরে চোখের জল ঝরতে লাগল। মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপের আলোয় সে দেখতে পেল, বৌয়ের ধূলি-ধূসরিত বাদামি চুল, শীর্ণ একখানি হাতে চিবুক ন্যস্ত—দেখলেই মনে হয় যে, সেখানে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা নেমে এসেছে। হয় তো সে নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করেই নিঃশব্দে কাঁদছে।

'তোর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। কি দুর্ভাগিনী তুই। যে লোক তোর পরনের কাপড় দেয় না, পেটে দেয় না খাবার, তোর ভাগ্যে তেমনি সোয়ামীই তো জুটবে। এই তোর ভাগ্যের লেখন। ...'

স্বামী তবু কিছুই বলতে চাইল না, গরুটার কথা ছাড়া তার মনে তখন আর কোন চিন্তাই স্থান পায়নি। কাজেই সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সে ভাবছিল : এই বুড়ী ডাইনিকে দিয়ে আর্থিক কোন লাভই হচ্ছে না, গরুর বাচ্চা হয়, কিন্তু ও কি ?— যে মুরগী ডিম পাড়ে না, ও তারই সামিল। হ্যাঁ, ওই বুড়ী তা-ই, সন্তান ধারণের

যোগ্যতা ওর নেই। কথাটা সম্প্রতি ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছ থেকে শিখেছে।

তারা দু-জনেই সাগ্রহে আর একটি সন্তান কামনা করে। স্বামীর কাজে সাহায্য করবার জন্যে সে চায় পুত্র, আর ভবিষ্যতে নির্ভর করতে পারে এমন এক জন স্ত্রীর কাম্য। কিন্তু তাদের উভয়ের সম্পর্কটা দিন-দিনই যেন ঘোরালো হয়ে উঠছে। স্ত্রীর অভিযোগ ঃ স্বামী যথাসাধ্য রোজগার করছে না, সংসারের অভাব অনটনের দিকে তার কোন দৃষ্টি নেই। অপর পক্ষে স্বামী স্ত্রীকে অশিক্ষিত গেঁয়ো ভূত বলে তাচ্ছিল্য করে। বলে—জন্তু-জানোয়ারের লেজ যেমন সব সময়েই অপরিহার্য ভাবে তার পেছনে ঝুলে থাকে, তেমনি স্ত্রী স্বামীর পেছনে ঝুলে আছে। যবে থেকে স্বামী জেলায় চাষবাসের উপদেষ্টার পদ পেয়েছে সেদিন থেকেই উভয়েয় মধ্যে সদ্ভাবে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আগে তারা দু-জনেই সমানে ঝগড়া করত, কিন্তু এখন দিন দিনই স্বামী নীরব হয়ে যাচ্ছে। ফলে বৌ আরও পড়ছে মুষড়ে। স্বামীকে দেখে মনে হয় তার মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে, আর বৌর তিরিক্ষে। বৌ বুঝতে পেরেছে যে, স্বামী যেন দিন-দিনই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ও যেন আর স্বামীর নাগাল কোন দিনই পাবে না। বৌ চায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে, আর স্বামী? বৌ তা বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, এ নিছক অত্যাচার! বৌ যখন বুঝতে পারল যে, সে বুড়ী হয়ে গেছে, আর স্বামী তখন যুবক—আর তাই সে স্বামীকে খুশি করতে পারছে না, তার অনুরাগও উদ্রেক করতে পারছে না।

তার ফোঁপানি ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। বৌ আশা করল যে, ধাক্কা দিয়ে গালাগালি দিয়েই তাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু স্বামী প্রাণপণ চেষ্টায় মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে রইল।

তার পর তার অজ্ঞাতসারেই তার মনে একটা দুষ্টু চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল :

'আমার যে যৎসামান্য জায়গা-জমি আছে তা সবই ওকে দান করে দেবো। শুধু রেঁধে দেওয়ার জন্যে আমার কাউকে চাইনে। আমি কুমারের জীবন যাপন করব। ওই রান্না-ঘর, এই কুঁড়ে-ঘর, এই বাসন-কোসন—সব কিছুই ওকে দান করব। সামান্য একটা বিছানা আর খান কয়েক জামা-কাপড় মাত্র সঙ্গে নেবো। ছেলেপিলে তো আর নেই। জমি-জায়গা আসবাব-পত্র ওর থাকবে। ও বরং একটা পুষ্যি নেবে, আর আমি ..' তার সর্বাঙ্গ হালকা হয়ে গেল, পাশ ফিরল। তার পাশে যে মেনি বেরালটা ঘুমোচ্ছিল, সেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কিন্তু আবার পরক্ষণেই শুয়ে পড়ল। এই বিড়ালটা তারা তিন বছর ধরে পুষছে। ও নিজে মোটেই বিড়াল পছন্দ করে না। কিন্তু এই ধোঁয়া রঙের বিড়ালটাকে কেন যেন ভালবেসে ফেলেছে। খেটে খুটে এসে বিশ্রামের জন্য যখন খাঙ-এর উপর ব'সে খাওয়ার প্রতীক্ষা করে তখন এই বিড়ালটা তার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকে।

বৌ তখনও রেগে আছে। তার অবহেলায় স্বামীর মনে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। স্বামীর ভয় হল, হয় তো সে কাচের বয়ামটা ভেঙে ফেলেছে। এই বয়ামের মধ্যে শিমের বিচি রাখা হত। স্বামী শিমের বিচি অত্যন্ত ভালবাসে। সে কথা কইতে চাইল না, পাশ ফিরে শুয়ে রইল। খাঙের শেষ প্রান্তে যে দিকে পা থাকে, সেখানে একটা ঝুড়ির মধ্যে মুরগীর বাচ্চাগুলি ছিল, পা ছড়াতে গিয়ে ঝুড়িটা পায়ে ঠেকল। বাচ্চাগুলি ভয়ে সজোরে আর্তনাদ করে উঠল।

'তুমি জান যে আমি অসুস্থ, বেশী দিন আর বাঁচব না, অথচ তবু আমাকে এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করছ না। আমি কত দিক সামলাই

বল। ঘাস কাটব, গরুর হেপাজত করব। গরুটার বাচ্চা হবে, সেদিকে তোমার এতটুকুও খেয়াল নেই ...' কথাগুলি বলতে বলতে বৌ উঠে দাঁড়াল। হয় তো তার দিকেই আসছে মনে করে সে চট্ করে খাঙ থেকে নেমে সোজা উঠোনে ছুটে গেল। তার মনের যা-কিছু উৎসাহ সবই ঠাণ্ডা মেরে গেল। আপন মনেই বলে উঠল : 'গরু-বাছুর সব কিছুই তোমার রইল। ...'

পাহাড়ের ও-পাশে কুমড়োর ফালির মত চাঁদ উঠেছে, তারই জ্যোৎস্নায় উঠোনের একাংশ বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। উঠোনের মাঝখানে একটা কুকুর শুয়ে আছে, মুনিবকে দেখতে পেয়েই এক পাশে সরে গেল। আপনা থেকেই সে গোয়াল-ঘরের দিকে গেল ; গোয়াল ভরতি ঘাস রয়েছে। গরুটা অন্ধকারে কাশছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে। 'দূত্তোর, বাছুর এখনও বেরিরে আসছে না কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের সভার কথা মনে করে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটা ছায়া-মূর্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ছায়া-মূর্তিটি ফিস-ফিস করে বলে উঠলো, 'কি, বাচ্চা হল ?' ছায়া-মূর্তির এক হাতে একটা ঝুড়ি, আর এক হাতে চৌকাঠ ধরে ওর পথ রোধ করল।

'কে, হোআ কোয়াইং, তুমি ?' কথাটা সে খুব আস্তেই বলল। তার বুকটা তখন ঢিব-ঢিব করে উঠেছে।

হোআ কোয়াইং তার পড়শী, যুবক-সমিতির সভাপতির স্ত্রী. স্বামীর বয়স আঠার আর স্ত্রীর তেইশ। কাজেই তাদের মিলন সুখের হয়নি। স্ত্রী তালাকের কথা বলেছে। সে নারী-সমিতির পরিচালক-মণ্ডলীর এক জন সদস্য, জেলার জনসভায় মনোনীত হয়েছে।

এবার নিয়ে ও তিন-চার বার হো-র সঙ্গে এই গোয়ালেই কথা বলবার চেষ্টা করেছে। এমন কি, দিনের বেলাতেও যখন তাদের মধ্যে দেখা হয়েছে তখন হোআ-র চোখ দু'টিতে হাসি ফুটে উঠেছে। হো কিন্তু হোআকে আদৌ পছন্দ করে না, বলতে গেলে ঘৃণাই করে; কিন্তু সময় সময় মনে হয়েছে যে, হোআকে জোর করে ধরে এনে দলে পিষে ফেলে।

তার বব্-করা চুলে ও উদলা কাঁধে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। হোআ নিজের ঠোঁট দু-টি আস্তে আস্তে কামড়াতে কামড়াতে হো-র দিকে তাকিয়েছিল। হাবা ছেলের মত হো দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি!...'

হো-র সর্বাঙ্গে একটা সাংঘাতিক উত্তেজনা যেন ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হল। এমন একটা কিছু সে করতে চাইল যা বীভৎস, দুঃসাহসিক ও নির্ভীক। কিন্তু হঠাৎ আর একটা ঝোঁক এসে তাকে পেয়ে বসল। হোআ-র চিন্তা সে যেন ঠেলে দিল দু-হাতে।

'না, হোআ কোয়াইং, তা হয় না। শিগ্গির তুমি কাউন্সিলের সদস্য হবে। আমাদের দু-জনের উপরই গুরুতর দায়িত্ব আছে। আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে।' হো তাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল, পিছন ফিরে আর তাকাল না পর্যন্ত। বৌ তখন শুয়ে পড়েছে। হয় তো তখনও কাঁদছে।

'হেই!...'

আর কিছু না বলে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে-ও শুয়ে পড়ল। এই মাত্র যা ঘটেছে তার সঙ্গে যেন আর এর কোন সম্পর্ক নেই। ঝড়ের অব্যবহিত পরে যেমন স্থিরতা আসে ঠিক তেমনি স্থির ভাবে কথাটা সে ভাবল। তার মনে হল, সে ঠিকই করেছে।

বৌকে ডেকে বলল, 'এখন ঘুমোও, বাচ্চা এখনও হয় নি। হয় তো কাল সকালের দিকে হবে।'

স্বামীকে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে দেখে সে কান্না থামাল, প্রদীপটাও নিভিয়ে দিল।

'এই বুড়ী কোন কাজের নয়, তবু ও থাকুক, রান্না করুক। তালাক দিলে লোকের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে।'

আঙিনায় মোরগগুলো ডাকছে। বৌ জামা-কাপড় ছেড়ে তার পাশে শুয়ে আছে। আবদারের সুরে জানতে চাইল, 'তুমি কি কাল ভোরেই বেরিয়ে যাচ্ছ? সভার কি আর শেষ নেই? ... গাইটাকেও তো দেখা-শুনা দরকার?'

কিন্তু তখন আর গাইয়ের কথা ভাববার সময় ছিল না, ঘুমোনো দরকার। চোখ বুজে প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করল, কিন্তু সভা আর জনতা ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না, তার মাথায় নানা রকম শ্লোগান গিস্ গিস্ করতে লাগল:

'যথাযোগ্য প্রচারের অভাব।' 'গ্রামটা অশিক্ষিত।' 'মেয়েদের মধ্যে কাজ এখনও শুরু হয়নি।'

যেই এ-সব মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সে অস্থির হয়ে উঠল। গ্রামের উন্নতি কেমন করে হবে? কর্মীর অভাব এত বেশী! কিন্তু সে একা কি করতে পারে, কতটুকু পারে সে? সে নিজে, বলতে গেলে, কিছুই জানে না। কোন দিন স্কুলেও যায়নি, লিখতে-পড়তেও জানে না। একটি ছেলে পর্যন্ত নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ জেলার চাষীদের উপদেষ্টা, কাল তাকে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে।

দেয়ালের কাগজগুলো ক্রমেই সাদা হয়ে আসছে। পাশের বাড়ীর কে যেন ঘুম থেকে উঠল। আর সেই মাত্র হো হ্ওয়া-মিং তন্দ্রাভিভূত

হয়ে পড়েছে। তার জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা স্ত্রী তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার কোটরগত চোখের কোণে তখনও এক ফোঁটা অশ্রু জমে রয়েছে। হো-র পাশে বেড়ালটা শুয়ে ঘড়-র ঘড়-র করছে। ঘরখানি বেশ উত্তপ্ত, শান্তিপূর্ণ।

ক্রমে দিনের আলো দেখা দিল।

খবর

এক

'রান্নাঘরে ভাগো বুড়ী!' সিঁড়ি দিয়ে উপরের ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকতে ঢুকতে ছেলে আ-ফু বলে উঠল। আ-ফুর পিছনে সেই ছেলেটিও ঢুকল, ধূসর রঙের ভাঁজ করা আলখাল্লাটি তার হাতে ঝুলছে।

একটি সরু জানালার ধারে পাতলা একখানা তক্তা দিয়ে ঢাকা হাত দুয়েক লম্বা এক ফালি জায়গায় বুড়ী বসেছিল। তক্তাখানা সরিয়ে দিলেই ঘর থেকে একটু আলো এসে পড়ে, আর সেই আলোতে বুড়ী তার নাতির ছেঁড়া পাজামা মেরামত করে।

তারা দুজন ঘরে ঢুকল। আ-ফু মায়ের দিকে না তাকিয়েই গা

থেকে নীলরঙের আলখাল্লাটা খুলে ফেলল। নিজে বিছানায় বসে পড়ে সঙ্গীকেও পাশে বসতে বলল।

বুড়ী বুঝতে পারল, ওদের সেই একই কাজ এবার শুরু হবে। যেদিন থেকে এর সূত্রপাত, সে দিন থেকেই ওর ছেলে এমন এক রাজ্যে বিচরণ করছে যাতে ওর মনে হয়, সে রাজ্যের কিছুই ও বোঝে না। সে এমন একটা রাজ্য যেখানে ও প্রবেশ করতে পারে না। ছেলে আ-ফু সেই রাজ্যের শিখরে দাঁড়িয়ে তার মাকে উপেক্ষা করে চলে। আর বুড়ী ছেলের এই উপেক্ষায় মনে মনে রুষ্ট না হয়ে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক, ছেঁড়া কাপড়গুলো গুটিয়ে নিয়ে মাথা নীচু করে সে ঘরের বার হয়ে গেল এবং যেতে যেতে নবাগতের দিকে একবার চোরা চাউনি চেয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও রান্নাঘরে গেল না। এবং সিঁড়ি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের একটি ছোট দরজা দিয়ে চিলে কোঠায় গিয়ে ঢুকল। ঘরখানি এত ছোট যে, অতিকষ্টে একজন লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। সূর্য উঠলেও সেখানে যথেষ্ট অন্ধকার থাকে। অন্য ঘরের সঙ্গে অতি পাতলা একটি কাঠের বেড়া দিয়ে একে পৃথক করা হয়েছে। এখান থেকে ছেলেদের প্রত্যেকটি কথা খুব স্পষ্ট করেই তার কর্ণগোচর হয়।

কারখানা থেকে আ-ফুর জনকয়েক সহকর্মীও ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হল। তার চোখের উপরেই তারা সকলে নড়বড়ে সিঁড়িটায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে সেই একটি জানালা-ওআলা কুঠুরিতে গিয়ে ঢুকলো।

তারা যখন আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল, বুড়ী তখন একাগ্রভাবে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল। একটি শব্দও তার কান এড়িয়ে গেল না।

তখন সন্ধ্যা। সরু ঘিঞ্জি গলিটায় লোকের ভিড় অনেক। কেউ কেউ নিজেই নিজের হাত-পা দলছে, আবার কেউ বা অপরের শরীর মর্দন করে দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ-বা গলির উপর ছোট ছোট টুল নিয়ে আধা-উলঙ্গ অবস্থায় বসে নলখাগড়ার ভাঙা পাখা নিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। তারা যতরাজ্যের গল্প বলছে, হাসি-ঠাট্টাও চলছে সমানে, আবার কেউ বা মেঠো গান গেয়ে চলেছে—যা শ্রমিকরাই জানে। মাঝে মাঝে এদের এই কোলাহলের জন্যে কথাগুলি শুনতে বুড়ীর অসুবিধা হয়, কিন্তু সে দেয়ালে কান পেতে খুব মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যেকটি কথা শোনবার চেষ্টা করে।

ক্রমে অন্ধকার হল। প্রতিটি পরিবারেই রান্না শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক কুঁড়ে থেকেই কাঠের জ্বাল ও সস্তা তেলের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। গলিটা ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে সেই ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যায়। কিন্তু বুড়ী যে অন্ধকূপটায় রয়েছে সেখানে ধোঁয়া জমেই থাকে, একটুও বেরিয়ে যায় বলে মনে হয় না। তাই সেখানকার হাওয়া ভারী হয়েই থাকে। বুড়ী কোনমতেই কাশি চেপে রাখতে পারে না।

'খক্ খক্—খক্ খক্—খক্ খক্!'

'তোমার মা অসুস্থ নাকি? কি বিশ্রি কাশি!' বুড়ী ধোঁয়াচ্ছন্ন কুঠরিতে যখন দম বন্ধ হয়ে মরছিল তখন পাশের ঘর থেকে কে একজন বলে উঠল।

ফলে আ-ফু বুঝতে পারল বুড়ী ওখানে আছে। ডাক দিয়ে সে বলল, 'মা, ও গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো এখ্খুনি! বাপ্, কি গরম! আচ্ছা, বলো তো, ওখানে তুমি কি করতে গিয়েছ, কি দরকার তোমার?'

সে তখন এক টুকরো নেকড়া নিজের মুখের ভেতর ঠেসে পুরে দিয়েছে, একটুও শব্দ করল না। সে জানে যে ওরা ওকে চায় না, তবু চোখের জল ও নাকের জল সত্ত্বেও সে ওদের সব কথাই শুনবে সংকল্প নিয়েছিল। নাতি ও পুত্রবধূ নীচে খাচ্ছিল, তারাও বুড়ীকে ডাকল কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না। অসংখ্য মশা দল বেঁধে এসে তাকে কামড়াতে লাগল, হাত নেড়ে সে মশা তাড়াতে লাগল। মশাগুলো পালাতে গিয়ে তার ক্ষীণ রক্তশূন্য হাতের উপর ঠিক্‌রে পড়ছিল। অবশেষে অভ্যাগতেরা উঠে দাঁড়াল এবং একে একে চলে গেল। আ-ফু রান্নাঘরে ঢুকেই কিছু ঠাণ্ডা খাবার খুঁজে বেড়াল। সকলে নীচে চলে যাওয়ার পর বুড়ী হামাগুড়ি দিয়ে সেই অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আর সকলের সঙ্গে যোগ দিল।

'কি হয়েছে তোমার ? অসুখ করেছে ?' পুত্রবধূ জিজ্ঞাসা করে। সে তখন পিছনের দরজায় বসে বাচ্চাকে আদর করছিল, আর আ-ফু তার পাশে বসে বাটিতে খাবার নিচ্ছিল।

'দূর বোকা, অসুখ হতে যাবে কেন, আমি ভালই আছি।'

তার মুখ চোখের বলিরেখায় একটা তৃপ্তি ও সন্তোষের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং ওই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে বুড়ীর অন্তরের সেই ধারারই সন্ধান পাওয়া গেল। তার ছেলে বা পুত্রবধূ—কারুর নজরেই অবশ্য তা ধরা পড়ল না।

দুই

ছেলে ও পুত্রবধূ কারখানায় কাজে গেছে। দুই নাতী ছেলেদের সঙ্গে গলিতে খেলা করছে।

বুড়ী বসে বসে শতছিন্ন একটা আলখাল্লা মেরামত করছে। আলখাল্লাটার আসল চেহারা এখন আর চেনাই যায় না। জামাটা ইয়ে তাঙ্গুর। সে উপর তলায় থাকে, তার বৌ কারখানায় কাজ করে, রান্না ও কাপড় চোপড়-কাচার পর আর মেরামতি কাজের অবসর পায় না।

বুড়ী সেলাই করতে করতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কেন জানি তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কারুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য সে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিছু করবার জন্যে সে উতলা হয়ে পড়েছে। কিন্তু কার সঙ্গে সে কথা কইবে, কার কাছে বেদনা জানাবে? তার নিজের পেটের ছেলেও তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তা ছাড়া, কি সে বলবে, কি সে করতে চায়—তাও তার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। অনেকক্ষণ ধরে সে একা একা বসে রইল, ভারী বিশ্রী বোধ করতে লাগল। তবু সে ভেবেই চলল। হঠাৎ কি ভেবে সে বুড়ী ওয়াং-গিন্নীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

ওয়াং পো-পো তখন একটা কাঠের গামলায় কাপড়ে সাবান মাখাচ্ছিল। বুড়ী-মা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং খানিকক্ষণ বিশেষ কিছু বলল না, পরে কিছু না ভেবে চিন্তেই বলতে শুরু করল:

'সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে তোমার, এঁ্যা, আমরা সেবার এক সঙ্গে যেখানে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম?'

'সে কি বোন ভুলতে পারি? সকলেই রান্নাবান্না করে খেয়েছিলাম।

যার ঘরে যা ছিল সকলেই কিছু কিছু দিয়েছিল। আমি তখন বলেছিলাম, এমনি করে যদি চিরকাল বাঁচতে পারি তো ভারী চমৎকার হয়।'

ওয়াং-গিন্নী কাজ করতে করতে একবার থামল এবং ভিজে হাত দু-খানি উরুতে মুছে নিল। পাশের বাড়ীতেই বুড়ী লী বাস করে, হাঁটতে হাঁটতে সে এসে সেখানে উপস্থিত হল এবং এসে সে উত্তেজিত হয়ে তাদের আলোচনায় বাধার সৃষ্টি করল।

'হেইমা! আমরা প্রথমত এটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। প্রত্যেকেই বলল, আ সান আমাদের যা বলেছে তা একবর্ণও সত্যি নয়, লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আসলে যখনই ব্যাপারটা সত্যি বলে প্রমাণ পেলাম, তখনও কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন বলে মনে হল এবং যতক্ষণ না তারা আমাদের নিমন্ত্রণ করল তার আগ পর্যন্তও আমরা এতটুকু ঝুঁকি নিতে রাজি হইনি। ব্যাপারটা যে অত অল্প সময় স্থায়ী হয়েছিল সেটা সত্যিই বড় খারাপ। কিন্তু নির্বংশের ব্যাটা পুলিস ও জাপানী গুপ্তচররা এসে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিয়ে সবকিছু তছনচ্ করে দিল।'

'আচ্ছা, খাওয়াটা কি বে-আইনি? সত্যি কি তাই? ওই সব জ্যান্ত মড়া—'

'সে খাওয়া-দাওয়ার খরচ জোগাল কে, জান?' আ-ফুর মা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়ই সেই বড়লোক লিউ-ই জুগিয়েছে। পরে তাকেই না পুলিস শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

'কি বললে, লিউ। তাই কি? কিন্তু টাকা সে পেল কোথায়? বড়-লোকেরা কি ওভাবে টাকা খরচ করে কখনও? না, নিশ্চয়ই করে না। সে বরং আমাদের নিয়ে গিয়ে তার কাজ করবার জন্যে জন

খাটাত। আসলে টাকাটা এসেছিল' ... সে নিজের গলার স্বর খাটো করে প্রত্যেকটি শব্দ খুব সাবধানে উচ্চারণ করল।

'আই-ইয়া!' ওয়াং-গিন্নী ও লী-গিন্নী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'আসলে মোটেই একজন নয়,' আ-ফুর মা বলে উঠল। 'একজন তো নয়ই, অনেক, অনেক মানুষ। লাখ লাখ মানুষ একসঙ্গে প্রচুর টাকা জোগাড় করে যুদ্ধের সময় শাংহাই পাঠায় এবং সেই টাকাটা আমাদের জন্য পাঠানো হয়, কারণ আমরা জাপানী কারখানার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছিলাম, আর জাপানী দস্যুরা তখন শাংহাই আক্রমণ করেছিল! কারণ তখন আমাদের খাবার মত কিছুই ছিল না, তা তো জানই, আর সেই কারণেই তারা আমাদের ওই ভোজ দিয়েছিল।'

'তাই বল! যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে। গরীবেরা গরীবকে সাহায্য করে। এটা আমার জানা উচিত ছিল যে, লিউ অত বোকা নয়! কিন্তু তা তো যেন বুঝলাম, তুমি এসব জানলে কোথা থেকে?'

আ-ফুর মায়ের মন থেকে অবহেলার গ্লানি মুছে গেল। তার মনে হল যে, অনেক কিছুই সে জানে। তাই সে সগর্বে বলে উঠল:

'আগে ছিলাম একটা কূয়োর ব্যাঙ, বিছুই জানতাম না। কিন্তু কথাটা আমি শুনলাম এবং এও শুনলাম যে, তারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। আরও শুনলাম, আমরা তাদের কিছু উপহার পাঠাবার জোগাড়যন্ত্র করছি—'

'তুই-লা! এত খুব ভাল কথা। তারা যখন আমাদের সাহায্য করেছে তখন আমাদেরও তাদের সাহায্য করা উচিত', লী-গিন্নি বলে উঠল, যেন এমন সঠিক সিদ্ধান্ত সে সারা জীবনই করে আসছে।

'কিন্তু কে জানে কখন তারা শাংহাই পৌছবে?' ওয়াং-গিন্নি নিশ্চিন্ত হতে চায়।

'তারা আসবে—ঘাবড়িও না, একদিন তারা আসবেই। কত শিগ্‌গীর আসবে তা নির্ভর করছে আমাদের উপর। আমরা যদি বলি, আর দেরী করতে পারিনে, যদি কিছু পাঠিয়ে দিই, যদি তাদের তার করি, তা হলেই তারা তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আমরা যদি তাদের জানাই যে, আমরা বড় কষ্টে আছি, তা হলে নিশ্চয়ই তারা সর্বাগ্রে এখানেই চলে আসবে।' বুড়ী ওয়াং-গিন্নীকে বুঝিয়ে বলতে লাগল—যেন সে-সব কিছুই জানে। যদিও এ সবই তার শোনা খবর মাত্র, কিন্তু এ সবই সত্য বলে সে মনে মনে মেনে নিয়েছে, কাজেই সব কিছুই সত্য বলে বিশ্বাসও করেছে।

লী-গিন্নি বলল, 'আমার মনে হয়, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কিছু উপহার পাঠানো উচিত। সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, আমাদের আন্তরিকতা থাকলে তারা আমাদের কাজে হাসবে না। কেমন তাই না?'

বুড়ী-মা মনে মনে অত্যন্ত খুশি হল এবং ওয়াং-গিন্নিও তার সঙ্গে একমত হল যে, এরকম কিছু একটা করা দরকার। আচ্ছা, কি কেনা যায়? তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে বড়জোর কয়েক আনা পয়সা সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু তাই দিয়ে কি কিনবে? তারা এ নিয়ে বেশ খানিকটা মাথা ঘামাতে লাগল, পরে লী-গিন্নি প্রস্তাব করলে যে, তাদের মত আরও জন কয়েককে তারা তাদের দলে টানতে চেষ্টা করবে। ব্যাপারটা এভাবে মীমাংসা করতে পেরে তারা শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তাদের জরাজীর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখের সবগুলি দাঁত বার করে তারা হাসতে হাসতে প্রস্তাবটিকে কাজে পরিণত করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল।

তিন

তাদের সকলেরই একটা নতুন কাজ জুটল।

ওই তিন বুড়ী কাপড় কিনতে গেল, আর দুজনের উপর সুতো কেনার ভার দেওয়া হল। কিন্তু তিন পয়সায় সুতোর ফেটি পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। কাজেই, যাদের উপর সুতো কেনার ভার অর্পিত হল, তারা স্থির করল যে, বৌদের কাছ থেকে কিছু পয়সা সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজ হাসিল হওয়ার পক্ষে তাও যদি যথেষ্ট না হয় তা হলে অন্য আর সকলের কাছে আবেদন করবে। তারা জিনিস না কিনে পয়সা আঁচলে নিয়েই ফিরল।

যারা কাপড় কিনতে বেরুল, তাদের সমস্যাও বড় কম নয়। কি রকম কাপড় কিনবে ঠিক করতে না পেরে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল। শেষটায় তারা এমন একটা কাপড় পেল যা কাজের উপযোগী বলেই তাদের মনে হল। খানিকটা ইতস্তত করে তারা পয়সাগুলি গুণে দিল। কাজটা নেহাৎ সহজ নয়, আর তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তারা সজাগ। ধর, যে জিনিসটা তারা পছন্দ করে কিনে ফেলল, সেটা দিয়ে হয় তো সুষ্ঠু ভাবে কাজ চলবে না, তখন তাদের লজ্জার সীমা থাকবে না।

'কাজটা করতে হবে। অত ভাবলে চলে না। এক ফুটের দাম ছত্রিশ পয়সা মাত্র।'

কাপড় দিয়ে কি হবে দোকানী তা জানতে চাইল, কিন্তু বুড়ীরা কিছুই বলল না, মনে মনে হাসল।

'হাঁ, ঠিক, এটাই নে। দু-ফিট নিলেই চলবে তো?'

'হাঁ, এতেই হবে, তবে দোকানীর কাছে একটু ফাউ চেয়ে নিতে হবে।'

'কি ডাকাতী! এক ফুট লাল শালুর দাম ছত্রিশ পয়সা!'

কাপড় নিয়ে তারা চলে এল—যেন সম্রাটের জহরতের বাক্স তাদের হেপাজতে। কেনা জিনিসগুলির চার পাশে বার-তেরটি বুড়ী বসে কাজটা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল।

কেউ বলল, কাপড়ের টুকরোটার এক কোণে ফুল* থাকবে, কারণ তারা অন্য স্ত্রীলোকদের এরকম ক্ষেত্রে ফুল ব্যবহার করতে দেখেছে। আর এটা যখন উপহার তখন তার মধ্যে কোন ত্রুটি রাখা উচিত হবে না। তারা আরও কয়েকটা পয়সা জোগাড় ক'রে একটুকরো কালো কাপড় সংগ্রহ করতে ছুটল।

অবশেষে কাজটা সম্পূর্ণ হল। ফুলটা অবশ্য ঠিক জায়গায় বসাতে পারেনি, আর ছুঁচের কাজও তেমন ভাল হল না, কিন্তু প্রত্যেকের অন্তরই খুশিতে ভরে উঠল।

ভাঁজ করে রাখবার আগে তারা বার বার সেটার দিকে চোখ মেলে তাকাতে লাগল। তার পর সকলে একসঙ্গে তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা আলোচনা করতে লাগল। ভেবে দেখ, শাংহাই আর একটা জগৎ, দিনে সাত ঘণ্টা কাজ করে, মজুরীর হারও বেশী। রবিবারে কাজ করতে হবে না এবং থিয়েটারে সত্যি সত্যি বিনিপয়সার প্রবেশ-পত্র।

আ-ফুর মাকে জিনিসটি যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার ভার দেওয়া হল এবং সেও কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু কেউ ভাবল, 'আমাদের মত বুড়ীদের এই উপহার কি তারা আদৌ গ্রহণ করবে?'

* রক্ত পতাকার ওপর কাস্তে হাতুড়ীর চিহ্নকে ওরা বলে ফুল।

চার

আ-ফু আবার সেই ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী এল। সিঁড়িতে তাদের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বুড়ির বুকটা ভয়ে কাঁপতে লাগল, সেলাই করছিল, হাতটাও সাংঘাতিকভাবে কেঁপে উঠল। বুড়ী তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না, একটুও না নড়ে চড়ে সেখানেই অনড় ভাবে বসে রইল।

'মা, এখান থেকে যাও—রান্নাঘরে যাও!' বুড়ী প্রসন্নভাবে জবাব দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই তার মুখ দিয়ে বের হল না। সে তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলিটা গুছিয়ে ফেলল তারপর সেই মহামূল্য জিনিসের পুলিন্দাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করল। লোকটির দিকে চাইবার জন্য বুড়ী মাথা তুলল। দেখল তার চোখ দুটিতে একটা সদয় ভাব। ফলে বুড়ীর মনে সাহস বাড়ল।

ওদের সামনে দিয়ে লেংচাতে লেংচাতে সিঁড়ির কাছে যেতে যেতে বুড়ী ইতস্তত করতে লাগল।

'ও কি মা, অমন করছ কেন?' তার অস্বাভাবিক চালচলন দেখে আ-ফু কারণ জানতে চাইল।

সে পিছন ফিরে সোজা পুত্রের বন্ধুটির কাছে এগিয়ে গেল। উপহারটি বুক থেকে হাতে তুলে নিয়ে দৃঢ় হস্তে ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে বলল ঃ

'এটি তাদের জন্যে, আমাদের হয়ে তাদেয় পৌঁছে দিও বাবা!'

'তাদের? তারা কারা মা?'

'কেন, তুমি তো জান। তারা, তারা! এই যাদের কথা তোমরা দু-জনে হামেশাই বলাবলি কর। আমরা—বুড়ীরা জানি—'

‘ও !’

‘আমরা চোদ্দজন মিলে এই সামান্য উপহারটি তাদের জন্যে বানিয়েছি, বুঝলে ?’

পুলিন্দাটি খুলতেই একটা খুশির হাসিতে ছেলেটির মুখখানি ভরে উঠল। আ-ফু উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল :

‘তুমি কি বলতে চাও যে তোমরা বুড়ীরা এটা তৈরী করেছ ?’

আনন্দে গর্বে বুড়ী তখন কাঁপছিল এবং মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে তার মুখের জয়ের হাসিটুকু সে দমন করতে পারল না।

‘আমরা আশা করছি, তারা শিগগিরই আসবে।—’

‘মা তোমরা জানলে কেমন করে বল তো ?’

‘তোদের আলোচনা শুনে বুঝেছি।’ একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বুড়ী জবাব দিল।

‘হা, হা, হা, হা !’ তারা আনন্দের সঙ্গে হেসে উঠল, কিন্তু তাদের ভাব লক্ষ্য করে বুড়ীর মন আবার অস্বস্তিতে ভরে উঠল। অবশেষে, সাহস করে সে তাদের জিজ্ঞাসা করে বসল :

‘আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, তোমাদের সমিতি আমাদের মত বুড়ীদের ভরতি করে কি-না ?’

‘তোমার মত দুষ্টু মেয়েদের নয় অবশ্য !’ আ-ফু হেসে উঠল। তারপর সে মাথা নেড়ে বুড়ীকে বললে যে, মানুষ মাত্রেই—যারা কাজ করতে চায়—তাদের সকলকেই ভরতি করা হয়।

‘আমি তাই জানতে চাই। আচ্ছা বল্ তো বাছা, তারা কি চায় ? আমরা বুড়ীরা অবিশ্যি তাদের হুকুম তামিল করব। যখনই আমাদের ডাকবে, আমরা বিশ-ত্রিশজন একসঙ্গে হাজির হব।’

‘হাও হাও—খুব ভাল, সত্যি খুব ভাল !’

ইতিমধ্যে আর সকলেও সিঁড়ি বেয়ে সেই ছোট্ট ঘরখানায় এসে সম্মিলিত হল এবং সকলেই বুড়ীদের কাহিনী শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। তাদের আগ্রহ দেখে বুড়ী-মার তামাটে মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলিটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

'আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য!' ছোকরারা পরস্পরে বলাবলি করছে, বুড়ীর কানে ভেসে এল। 'কি আশ্চর্য, বুড়ীরাও তা হলে সত্যিসত্যিই নিজেদের সংঘবদ্ধ করছে!'

উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে সে তাদের দিকে তাকাল, তারপর একবার পতাকাটির দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কালো ফুলের চারপাশে লাল জমিটা যেন জ্বলছে।

তারপর বুড়ী কেমন করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল, তা সে মনেও করতে পারে না।

দেশ পুনর্গঠনে সড়ক বাঁধার কাজে নতুন চীনের জনসাধারণ (চীন উডকাট) ঃ

শিল্পী—ইয়ান হান

গণ-সেনাবাহিনীর সেনাশিবিরে একটি রাত (চীন উডকাট) ঃ

শিল্পী—লী স্যু-ইয়েন

পিঙ পিঙ

পিঙ পিঙ রেলগাড়ীর গল্প শুনেছে, ছবিতেও দেখেছে। তাইউয়ান-এ কমার্শিয়াল প্রেসের জানালায় রেলগাড়ীর নক্সা আছে। পিঙ পিঙ যখনই বাবার সঙ্গে বেড়াতে বার হত তখনই জানালার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। সত্যিকারের রেলগাড়ীর কথা সে ভাবতেও পারে না, তবে ছোট একটি নক্সা যদি পেত! একবার সে রিক্সায় চড়ে শহরে যায়, পথে একটা সিটি শুনতে পায়। মা বলেন, রেলগাড়ী আসছে। দুঃখের বিষয় সে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এবারে সত্যিসত্যিই রেলগাড়ীতে চড়তে যাচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সে, তার মা, দাদা, দিদি ও আরও অনেকে মিলে স্টেশনে গেল। তাদের অনেককেই সে চেনে না, তারা যেন সব অনাত্মীয়, বন্ধু নয়। প্রত্যেকটি রাস্তাই বড় বড় গাড়ী দিয়ে আটক করে রাখা হয়েছে। দাদা বলল, ও গাড়ীগুলোয় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গোলা-গুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু দিদি বলল, না, ওতে ময়দা বোঝাই আছে। দিনের বেলার চেয়ে সন্ধ্যা বেলাতেই রাস্তাগুলিতে গাড়ী চলাচল বেশী, গোলমালও বেশী।

স্টেশনে আরও অনেক লোকজন দেখা গেল, সকলেই তাদের অচেনা। কারুর প্রতি কারুর এতটুকু দরদ নেই, কেউ কাউকে যেন গ্রাহ্য করছে না। সকলেই যে-যার মত চলাফেরা করছে, ভিন্ন ভিন্ন দল, কারুর সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ নেই, কেউ কারুর দিকে নজরও দিচ্ছে না। পিঙ পিঙ দাদার হাতখানি শক্ত করে ধরে আছে। সে রেলগাড়ী দেখতে চায় কিন্তু দাদার সেদিকে খেয়ালই নেই।

একটু পরেই তাকে একটি অন্ধকার বাক্সের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল।

এই রেলগাড়ী! পিঙ পিঙ বড় নিরাশ হল। তা ছাড়া, ভিতরে বাতাস ছিল না, অন্য যাত্রীদের মধ্যেও অস্থিরতা যেন ছোঁয়াচে রোগের মত ছেয়ে গেল। তারা সকলেই কিন্তু জাপানীদের সম্পর্কে আলোচনা করছে। পিঙ পিঙ জাপানী উড়োজাহাজ আকাশে উড়তে দেখেছে, জাপানী বোমার বিস্ফোরণের শব্দও শুনেছে। তাতে সে মোটেই ভয় পায়নি, তবে যাত্রীদের আলোচনা থেকে জাপানীদের যে চিত্র তার চোখে ভেসে উঠল তা সত্যিই সাংঘাতিক।

দেখতে দেখতে রেলগাড়ী চলতে শুরু করল। 'হুঙ্ টুঙ্, হুঙ্ টুঙ্... গাড়ী এক অদ্ভুত গতিতে এগোতে লাগল। থেকে থেকে কানে তালা লাগা সিটি দিতে দিতে চলেছে। তার বড় ভয় হতে লাগল। শরীরটাও ঝিম

ঝিম করতে লাগল। একটা গুরুভার বোঝা যেন তার মাথায় কে চাপিয়ে দিয়েছে। সে নিরুপায় হয়ে মায়ের কাছে সরে গিয়ে তার কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাড়ীটা যখন য়ুৎজে-তে পৌছল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কে যেন তাকে রাস্তার ধারে নিয়ে গেল। সে ঘুমে কাতর চোখ দুটি বার বার মুছে গোটা গাড়ীটা দেখতে পেল। কেমন চুপ করে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনেই লোহার বেড়া, গাড়ীর ভিতরকার স্বল্প আলো এসে বেড়ার উপর পড়েছে। গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে।

পিঙ পিঙের কাছে এই ভ্রমণ ভারী অদ্ভুত লাগল। সে এর আগে গরুর গাড়ী ও গাধায় টানা গাড়ীতে চড়েছে, গাধার পিঠেও চড়েছে, অবশ্য মায়ের সাহায্যে। পাহাড়ের উঁচু টিলায় চড়া, ঝরণা পার হওয়া—এ সবই ভারী মজার ব্যাপার। তবে হতভাগা জাপানীরা পিছনে লেগে থেকেই যত মুশকিল করে। গাড়ীর কামরায় যে সব যাত্রী—পুরুষ, নারী, ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই এক আলোচনা—জাপানী; এ ছাড়া যেন আর কোন কথাই নেই। পিঙ পিঙ যখন ছেলেমানুষ, তখন দুষ্টুমি করলেই মা কেবল শাসাত, 'বেশ, তোকে জাপানীদের হাতেই তুলে দেবো।' সন্ধ্যাবেলায় যখন পিঙ পিঙ কিছুতেই ঘুমোয় না, মা তখন বলে ওঠে, 'এখনও ঘুমো, নইলে জাপানীরা আসবে।'

তারা অন্য যাত্রীদের ছেড়ে শহরে এসে পৌছল। এখানে পিঙ পিঙের মামার বাড়ী। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, দাদু তাকে খুব ভালবাসেন। দিনগুলি বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু শিগ্‌গীরই তার মনের অস্থিরতা বেড়ে গেল। কেন তার মনের অবস্থা ও রকম হল সে তা বুঝতে পারল না, কেবল এই বুঝল যে, যারা তার চার পাশে রয়েছে সে লোকগুলিকে

সে আর পছন্দ করতে পারছে না। মাকেও আর তেমন ভাল লাগছে না।

একদিন খুব ভোরে একটা স্বপ্ন দেখে সে জেগে উঠল। স্বপ্নে দেখল : গাড়ী ভরতি জাপানী, তাকে ধরবার জন্যে তারা লাফিয়ে পড়ল। মা মাটির উপর পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল, তাকে রক্ষা করবার কোন উপায়ই আর নেই। এমন সময় জন কয়েক চীনা, আর তাদের সঙ্গে হন্তদন্ত হ'য়ে দাদা, দাদু, পাশের বাড়ীর মামা ইত্যাদি সকলে ছুটে এল। তাদের মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ। জাপানীদের সকলেই ভয় করে, কাজেই তাকে যারা ভালবাসে তারা সকলেই ভয় পেয়ে গেল।

পিঙ পিঙ কান পেতে কি শুনতে চাইল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, কোথাও জীবনের কোন চিহ্নই নেই, উঠোনময় বরফের গুঁড়ো নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে। তার ভয় হতে লাগল। হয় তো বহু প্রত্যাশিত দিন আজ এসেছে—জাপানীরা এসে পড়েছে। মা আর সকলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। তার কথা তারা ভুলে গেছে, নয় তো সে দুষ্টু বলে তারা তাকে ফেলেই চলে গেছে। তার কান্না আসছিল, কিন্তু চোখের জলে কান্না আটকে গেল। মা কি করতে পারত? খাটিয়ার উপর সে নিরুপায় হয়ে শুয়ে পড়ল, তার আর কোন আশা নেই। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মা ঘরে এল, আদর করে তার পিঠ চাপড়ে দিল; তারপর জামা-কাপড় পরিয়ে দিল। সে মাকে যেন কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দিদিমা ঘরে ঢুকলেন। ফোকলা মুখে কি যেন ইঙ্গিতে বললেন। মা তাড়াতাড়ি আলনার দিকে এগিয়ে গিয়ে কতকগুলি কাপড়-জামা ও তাকের উপর থেকে আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র একটা বুচকি করে দিদিমার হাতে

দিল। যাওয়ার সময় দিদিমা নতুন কম্বলখানাও তুলে নিলেন। পিঙ পিঙের মনে হল, মায়ের আকারটা যেন ছোট হয়ে গেছে। চুলগুলি উস্কো খুস্কো, মুখখানি মলিন, পা দুখানি নেহাৎ ছোট— কথা বলে বেশী। মাটা ভারি অকম্মার ধাড়ি! পিঙ পিঙের ভারী রাগ হল, মাকে মারবার ইচ্ছা হল। কিন্তু কি মনে করে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি খেলতে বেরিয়ে গেল।

বাইরে যেখানেই যায়, তার মনে হয়, সব কিছুই যেন বদলে গেছে। দাদুর পরিবারের আর সকলের সঙ্গে দাদা ও দিদি কোথায় চলে গেছে। নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগছিল। প্রতিবেশীরা এসে চুপি চুপি কথা বলে। খেলা করবার মত কাউকে সে খুঁজে পেল না। বড় মাসিমার ছেলেটা দিনরাত কেবলই কাঁদে, কেবলই মায়ের কোলে থাকতে চায়। পিঙ পিঙ বাইরে যেতে চায়, রাস্তায় গিয়ে লোক-জনের যাওয়া-আসা দেখতে চায়; কিন্তু তার জো নেই, ভীষণ বরফ পড়ছে। প্রত্যেকেই যেন একটা অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় রয়েছে।

দুপুরের খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে খাকি-পোশাক-পরা জনকয়েক লোক এল। মা পিঙ পিঙকে বড়মাসির ঘরে নিয়ে গেল। দিদিমা আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে রয়ে গেলেন। তারা মাঝের ঘর ও পাশের ঘরটা থাকবার জন্যে নিলো। কাজেই ওদের চলে যেতে হল বড় মাসির ঘরে।

প্রথমটায় ও এদের দেখে ভারী ভয় পেয়ে গেল কিন্তু যখন দেখল যে তারা ভদ্রলোক, হেসে হেসে কথা বলে, ওকে আদর করে, দিদিমাকে শ্রদ্ধা দেখায়, খাতির জানায়, বড় মামাও দিদি-মাকে এতটা খাতির করে না; দিদিমা হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এ দেখে আর ওর মনে কোন ভয়ই রইল না, উঁকি

মেরে দেখতে লাগল। ও জানে তারা সৈনিক! তারা এগিয়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে খাবার দিল, ওকে শোনাবার জন্যে গানও গাইল। তারা নিজেরা হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে গেল। প্রথমে ওর সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে ওদের চলাফেরা, কথা-বার্তায় ও অভ্যস্ত হয়ে গেল। দেখল ওরা লোক ভালই। সকালে ওর মনে যে আতঙ্ক ছিল, কখন যে তা নিঃশেষে মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে তা জানতেও পারল না। মধ্যে মধ্যে মা উঠানে এসে ওকে ডাকে, কিন্তু ও সাড়া দেয় না।

সন্ধ্যার ঠিক আগে চারজন খাকি-পোশাক-পরা সৈনিক এসে পৌছল। কয়েক জনের হলদে গরম কোট গায়ে, হলুদ রঙের পোশাক পরা লোকগুলোকে দেখে পিঙ পিঙ ভয় পেয়ে গেল, কেন না, মা একবার বলেছিল যে, জাপানীরা হলদে পোশাক পরে। মাঝের ঘরে দু-জন হলদে পোশাক-পরা সৈনিককে থাকতে দেওয়া হল। তারা ঘরে ঢুকেই জামা খুলে ফেলল। তখন দেখা গেল তাদের গায়েও তেমনি খাকি জামা রয়েছে। ওর মনটা তখন ভারী হালকা হয়ে গেল। তাদের দেখবার জন্যে ও তখন ভিতরে গেল। তারা পরম আদরে ওকে গ্রহণ করল। সন্ধ্যাবেলায় তাদের দু-জন ওকে নিয়ে নাচ দেখতে গেল। দিদিমা, মাও গেল। ওরা শুনেছিল যে, মেয়ে সেনাদের নাচের আসর বসবে।

কিন্তু মেয়ে-সৈনিকদের নাচ দেখা গেল না। মঞ্চের উপর জাপানীদের দেখা গেল। যে কয়জন হলদে পোশাক পরেছিল, তারাই মঞ্চের উপর রয়েছে। তারা চীনদের মারে, তাদের ঘর পুড়িয়ে দেয়। তখন চীনা সেনারা এসে জনসাধারণের সাহায্যে জাপানীদের মেরে ফেলল। পিঙ পিঙ ভারী খুশি হল এবং চীনাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

এ সময় পিঙ পিঙের একটি মাত্র বিশিষ্ট বন্ধু জুটল—তার নাম মেজর চেন। তিনি মাঝের ঘরটায় থাকেন। মেজর চেন জাপানী সৈনিকের গরম জামা পরেছেন, পায়ের বুটও জাপানী সৈনিকের। তার কোমরে প্রকাণ্ড একখানা ঝকঝকে তলোয়ার ঝুলছে। এ তরবারিও তিনি কোন মৃত জাপানী সেনাধ্যক্ষের কাছ থেকে পেয়েছেন। পিঙ পিঙ সারাদিন মেজরের ঘরে খেলা করে, তিনি তাতে বাধা দেন না; তাদের যখন খাওয়ার সময় হয়, তখন যত লোকই থাক না, মেজর পিঙ পিঙকে তাদের সঙ্গে খেতে বলেন। ও দেখে, সেখানে যত সৈন্য ছিল তারা হলদে পোশাকই পরুক, আর খাকি পোশাকই পরুক, সকলেই কিন্তু মেজরকে খুব ভালবাসে।

ইতিমধ্যে মামা, দাদা ও আর আর সকলেই ফিরে এল। সকলেই মেজরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে আরও শুনল যে, তার মামা মেজরকে বলছে জাপানীদের কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা যতদিন আছে ততদিন যেন তিনি এখানেই থাকেন। পিঙ পিঙও স্থির করল যে, সে কখনও তার এ বন্ধুকে ছেড়ে দেবে না।

তার এই নতুন বন্ধু তাকে এতটা প্রশ্রয় দিয়েছে যে, পিঙ পিঙ প্রকাশ্যেই মায়ের অবাধ্য হতে চাইত: 'না, আমি তোমাকে চাইনে, কোন কম্মের নও তুমি। আমি এদের সঙ্গেই চলে যাব।' কখন কখন মা মেজরের ঘরে আসে, পিঙ পিঙ তখন গ্রামভারী চালে পা ফেলতে থাকে, তার অর্থ—তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। অথবা সে ইচ্ছে করে মাকে চটাবার জন্যেই সিগারেট ধরাত, যাতে করে সে বিদ্রোহ করবার সুযোগ পায়। মেজর সব সময় পিঙ পিঙকে আপন ইচ্ছামত চলতে দিতেন এবং আর

সকলকে বলতেন, 'আমার এই নতুন চেলাটি সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? চটপটে, কেমন, তাই না?' তখন পিঙ পিঙের মনে বেশ গর্বের সঞ্চার হত, খুশিও হত সে খুব।

এখন আর সে জাপানীদের ভয় পায় না। যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন ভাবে আলোচনা করে যে, সে যেন একজন সৈনিক এবং সত্যি সত্যিই মেজর চেন-এর সঙ্গে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে যেতে পারে। বিশেষ কারণে সভা বসেছে, পিঙ পিঙ মেজরের সঙ্গে সে সব সভায় যোগ দিয়েছে। সময় সময় মঞ্চের উপরও গিয়ে বসেছে, মঞ্চের সুমুখে অগণিত নরনারীর সামনে। মেজর বক্তৃতা দিয়েছে—তারা চীৎকার করেছে, হাততালি দিয়ে তার কথা সমর্থন করেছে। সঙ্গে পিঙ পিঙ-ও নিজেকে একজন কেউ-কেটা মনে করে গর্ব অনুভব করেছে।

তৃতীয় দিন পিঙ পিঙ শুনতে পেল যে, তার বন্ধু পরের দিনই চলে যাচ্ছে। মেজর কিন্তু খবরটা অস্বীকার করল; সেদিন রাত্রিতে বন্ধু তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এবার লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে উঠে তোমাকে আরও অনেকগুলি লড়াইয়ের গল্প শোনাব।'

ভোর না হতেই একটা বিশ্রী শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মা কেন যেন কাঁদছে। মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে চুপি চুপি বলছে, 'না, অত জোরে কাঁদতে নেই। পিঙ পিঙ জেগে উঠে অনর্থ বাধাবে।'

মা যেন কি গোপন করছে, তাকে জানতে দিচ্ছে না। চুরি করে মায়ের দিকে একবার চাইল। দেখল—দাদা প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে খাঁকি পোশাক, সে প্রদীপের সলতেটা নিয়ে আপন মনেই খেলছে। মা বলে চলছে:

'খুব সাবধানে থাকিস বাছা। এখন তোর মা তোকে দেখতে পারবে না। সৈনিক হওয়াটা ভাগ্যের কথা। তোর বড়দাও সৈন্যদলে ছিল বলে শুনেছি। তোর বাবা এখনও তায়ইয়ানে আছেন। কিন্তু অনেক দিন তাঁর কোন খবর পাইনি। আমি মেয়েমানুষ, কেমন করে তোদের সকলকার খোঁজ-খবর রাখব। তুই এখন মেজরের সঙ্গে যাচ্ছিস, কাজেই তোর জন্যে আর ভাবিনে। পিঙ পিঙের যদি বয়স আর একটু বেশী হত, তা হলে তাকেও তোদের সঙ্গে যেতে দিতাম। সেও ভাল করেই জানে যে, আমি তাকে রক্ষা করতে পারব না, তবে আমরা—মা ও ছেলে এখানে রইলাম, আবার কবে দেখা হবে, কে জানে।...'

পিঙ পিঙ আর শুনতে পারছিল না। তার চোখ দুটো জলে ভরে গেল, সে আর কিছু দেখতেও পেল না। দাদাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, কে যেন বাইরে থেকে দাদার নাম ধরে ডাকল—তাড়াতাড়ি করতে হবে, সকলে রওনা হয়ে গেছে, এখনই রওনা না হলে তারা অনেক পিছিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গেই মা দাদাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দিদিমা কি যেন চেঁচিয়ে বলছেন। মা তখন আর কাঁদছে না। যারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই দাদাকে নানা উপদেশ দিচ্ছিল।

পিঙ পিঙের মনে হল, সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। সে যেন আবার রেলগাড়ীতে সেই বিকটাকার জাপানীদের দেখত পেল। আজ যদি জাপানীরা তাকে খুন করে, তা হলে সে আর বাধা দিতে পারবে না। সে চেয়েছিল সৈন্য হতে, মেজর চেন-এর চেলা হতে, কিন্তু আর তো তার কোন আশাই রইল না। সে বুঝতে পারল যে, একমাত্র সৈন্য-দলে থাকলেই সে নিরাপদ। পাগলের মত জামা-

কাপড় না পরেই সে বাইরে ছুটে গেল। সে চীৎকার করছে, 'আমি যাব, ওদের সঙ্গেই যাব। আমি ওদের ...'

সে কাউকে দেখতে পেল না। জোরে বাতাস বইছে, বরফ গলে গলে ঝরে পড়ছে, দৌড়ে তাদের অনুসরণ করবার আগ্রহ তাকে পেয়ে বসল—তার মনে হল যেন কোন সাংঘাতিক একটা বিপদ তার পেছনে ধেয়ে আসছে। হঠাৎ একজোড়া শক্ত হাত তাকে ধরে ফেলল। তার চারদিকে অসংখ্য নরনারী। তাদের কাউকেই সে গ্রাহ্য করল না, প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল। সব কিছুই তার কাছে বিশ্রী ঠেকছে। সে কেবলই চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

একটু বাদেই তার জ্ঞান ফিরে এল। বাড়ীর সব নিস্তব্ধ। সব কিছুই সে স্পষ্ট দেখতে পেল। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে মায়ের দিকে উঁকি মারল। মা পাশে বসে আছে, হাত দু-খানি ঝুলে রয়েছে, যেন অসাড় ; দৃষ্টি দূরের কোন্ বস্তুর দিকে নিবদ্ধ। চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তৎক্ষণাৎ যেন সে মাকে বুঝতে পারল এবং সব কিছুর জন্যেই সে মাকে ক্ষমা করল। মায়ের বুকে নিজের মাথাটি রেখে মায়ের হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনতে লাগল। মা যখন তার মাথাটি তুলে ধরল, তখন পিঙ পিঙের চোখের জলে তার চোখ দুটি যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল—মায়ের অশ্রুসজল মুখখানি সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

বিচার

আ আও সেই কোন্ ভোরে একখানা অন্ধকার ছোট্ট কুঠরীতে গিয়ে লুকিয়েছিল, সারাদিন সেখানেই শুয়ে রইল। মাথা তুলতে পারে না; দেহ অনড়, নিশ্বাস ফেলতেও যেন সে সাহস পাচ্ছে না।

পাহাড়টার কোলে সুগন্ধ পাইন ও আরও নানা জাতের গাছের ঘন সন্নিবেশ, তারই পাশ দিয়ে একটি পার্বত্য নদী উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রে গিয়ে মিশেছে। এই স্রোতস্বিনীর ধারেই এক সারিতে সাতখানা বাড়ী, তার প্রায় সবগুলিই অত্যন্ত পুরানো এবং প্রত্যেকটিরই ভগ্নদশা। গ্রামের নাম 'তাও' গ্রাম। অথচ গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ 'তাও'

নয়। সাতখানা বাড়ীর চারিখানিতে চেন পরিবার বাস করে, পশ্চিম প্রান্তের বাড়ীখানা পারিবারিক দেবতার আবাস বলে আলাদা হয়ে আছে। মাঝখানের সুন্দর বাড়ীখানাই অপেক্ষাকৃত নতুন, প্রায় বছর আঠারো আগের তৈরী। এ বাড়ীর মালিকের নাম চিন, তাকে সকলেই 'বড়লোক চিন' বলে চেনে।

সপ্তম বাড়ীখানায় থাকে ওয়াং পরিবার। এ বাড়ীখানাই সব চেয়ে দৈন্যপীড়িত। বাড়ীর পাঁচখানা ঘরের মধ্যে যেখানা সব চেয়ে নিকৃষ্ট তার ভিতরই আ আও লুকিয়ে আছে। বাড়ীর অর্ধেকটা বড়লোক চিন-এর কাছে বন্ধকে আছে। বছর দুই আগে বৃদ্ধ ওয়াং যখন মারা যান তখন শ্রাদ্ধের জন্যে চল্লিশ হাজার পাই ধার নিয়ে বাড়ীর অর্ধেকটা বন্ধক দেওয়া হয়। ফলে বৃদ্ধা ওয়াং একমাত্র কন্যা আ আওকে নিয়ে বাড়ীর জীর্ণতম অংশে বসবাস করতে শুরু করে। এই অংশটা বড়লোক চিন-এর অধিকারে ছিল না। রান্নাঘরেরই এককোণে খানকয়েক তক্তা দিয়ে আলাদা করা হয়েছে, সেখানে আ আও একটা গোপন আতঙ্কে অভিভূত হয়ে শ্বাসরোধ করে পড়ে পড়ে কাঁপছে। কতকগুলি বাঁশের ঝুড়ি রান্নাঘরের দেওয়ালের গায়ে স্তূপীকৃত। ঘরে চারখানা কাঠের চৌকো টেবিল, ধারে ধারে লম্বা বেঞ্চ পাতা। বেঞ্চে লোক বসেছে অনেকগুলি, ছোট্ট ঘরখানির যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় জন ত্রিশেক লোক বসে গেছে। এদের মধ্যে তাও গ্রামের সকল পুরুষ তো আছেই, পাশের উ ও লাল দেয়াল গ্রামের লোকও আছে। তারা সকলেই ফুর্তি করে পানাহার করছে। তাদের অনেকের গায়েই নীল অথবা সাদা শার্ট, পরনে পাজামা; খালি পা। বড়লোক চিন, ব্যবসাদার উ-এরা লেখাপড়া জানা লোক, আর আছে লম্বা-চুলো মোড়ল, তার বার্ধক্যের জন্যে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। এদের

সকলের গায়েই লম্বা সূতীর আলখাল্লা। এ রকম গরীবের ঘরে এই সব আলখাল্লাধারী সম্ভ্রান্ত লোকদের কালেভদ্রে ছাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এদের উপস্থিতিতে ভোজ-সভার মর্যাদা যে অনেকখানি বেড়েছে এ সহজ সত্যটা সম্বন্ধে তারা প্রত্যেকেই ওয়াকিফহাল।

খাদ্যবস্তু অত্যন্ত সাধারণ। চারিটি করে বড় পাত্র। চার টেবিলের প্রত্যেকটিতে মাংস মাছ, শালগম আর স্থপ পরিবেশন করা হয়েছে। খাদ্যবস্তু টেবিলে পড়বার সবুর সয় না, দেখতে না দেখতেই হাওয়া হয়ে যায়। আবার পাত্র পূর্ণ হতে থাকে। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে গ্রামের মেয়েরা খেতে বসবে। প্রত্যেকেই মাংসের উপর ঝুঁকে পড়ল, সঙ্গে পাত্রভরা মদ্য। কারুর কোন সঙ্কোচ নেই, সাধারণ ভব্যতারও কোন বালাই নাই। তারা যে এই ভোজে যোগ দিয়েছে তাতে গৃহস্থের কল্যাণ-কামনা নয়, বরং নির্লজ্জা কন্যার জন্যে গৃহিণীর প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থারই পরিচয় দিচ্ছে। আসলেও তাই। বিধবা ওয়াং-এর এতে যত ঋণই হোক না! এরই নাম বিচার।

এই দুর্ভাগিনী নারী তার বাড়ীর বাকী অর্ধেকও বন্ধক দিয়ে যে টাকা জোগাড় করেছে, তাই দিয়েই এই অদ্ভুত ভোজের ব্যবস্থা করেছে। ব্যাপারটা দরদ দিয়ে দেখতে গেলেই দেখা যাবে যে, অভ্যাগতরা যে ভূরি-ভোজে মত্ত, তার প্রত্যেকটি মাংসের টুকরাই আসলে এই বিধবা ওয়াং-এর দেহের রক্ত-মাংস। কেন না, এই ভোজের ফলে তার চরম সর্বনাশ সুনিশ্চিত। বুড়ীর একমাত্র কন্যার জীবনরক্ষার জন্যেই সে এই লোকসান মেনে নিয়েছে। কন্যা যে সত্যিই অপরাধী তা অস্বীকার করবার জো নেই। আর এ ধরণের অপরাধে অপরাধী থাকে সাধারণত দুই জন, কিন্তু চীনদেশে, অলিখিত হলেও সব চেয়ে শক্তিশালী প্রথা অনুসারে এ ক্ষেত্রে অপরাধী একজন—মেয়েটিই একক

দায়ী এবং এই অপরাধের জন্যে গ্রামের যে-কোন লোক ইচ্ছা করলেই তাকে ধরে প্রহার, অপমান, গালাগালি, এমন কি, হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। কাজেই রুষ্ট গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জন করতে এরকম ব্যয়বহুল ভোজের ব্যবস্থা ছাড়া আর কেমন করে সন্তানের জীবন রক্ষা করা সম্ভব? বিশেষ করে বড়লোক চিন, ব্যবসাদার উ আর লম্বাচুলো গ্রাম্যমোড়লের দাক্ষিণ্য অর্জন করতে হলে এ ছাড়া আর গত্যন্তর কি? অবশ্য এর ফলে শেষ পর্যন্ত ওর নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনেও বিধবাকে এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হচ্ছে।

দু-দিন আগে বুড়ী পুত্রকে বিকেলের দিকে চিন-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। ছেলে নতজানু হয়ে দয়া ভিক্ষা করলে। বাড়ীর বাকী অংশটা বন্ধক রেখে ত্রিশ হাজার পাই ধার প্রার্থনা করে। এই দিয়ে মায়ের নির্দেশে ছেলে বাজার থেকে সের পনের মাংস, দশ সেরের উপর মাছ, সের দশেকের শালগম এবং ভোজের আরও জিনিসপত্র কিনে আনল। আগের দিন ভোর থেকেই বুড়ী ঘরদরজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে ও খাবার তৈরিতে লেগে গেল। চাল দিয়ে মদ তৈরী করল এবং আরও নানা কাজে এত ব্যস্ত রইল যে, একমূহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ পেল না।

অভ্যাগতদের আগমনের সঙ্গেই সে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একাকী সব কাজই করতে লাগল। প্রত্যেককে পরিবেশন করা, থালায় খাওয়ার দেওয়া, গরম গরম মদ ঢেলে দেওয়া ইত্যাদি একাই সে করল। মদের পাত্র খালি হতেই তার মনে হল নিজের দেহের পাত্রই খালি হচ্ছে, কিন্তু সর্বক্ষণই মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে, যেন কর্তব্য করতে পেরে সে সত্যি সত্যি তৃপ্তিই পাচ্ছে।

'কি হে ভায়া,' একটা অসভ্য লোক বলে উঠল, 'অত ভাবছ

কেন! এটা তো আর উৎসবের ভোজ নয়, যাকে বলে বিনি পয়সার ভোজ। বিনিময়ে তোমাকে কিছুই দিতে হবে না, কাজেই পেট ভরে খাও! কানায় কানায় ভরে ফেল।'

'ঠিক বলেছ ভাই,' লোকটা জবাবে বলল। 'আরে, খেতে তোমাদের এত দেরী হচ্ছে কেন, বল তো? খাও, খাও, এরকম সুযোগ হামেশা মেলে না।... সত্যি বলতে কি, এই মেয়েটা, কি বলে ওর নাম,—আ আও—আসলে একের নম্বরের নির্লজ্জ বেহায়া। তবে দেখতে ভারী সুন্দরী। চারপাশে ওর মত আর একটি বার কর তো দেখি? একেবারে খাঁটি—'

'আ আওর মত মেয়ে যত বেশী হয় ততই বিনি পয়সার ভোজ মিলবে,' তৃতীয় ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলে উঠল। 'আমি কিন্তু আশা করছি, আমরা আরও এরকম মেয়ে—'

'হুঁ! ফা বুড়ো! সব সময়েই তোমার হামবড়াই। আর এও বলি, তুমি তো মেয়েদের সম্পর্কে একটা আস্ত শয়তান! কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি হয়েছে সে সত্যিটা ভুলে যেয়ো না: এই মেয়েটা তোমাদের কাউকে গ্রাহ্য না করে তোমাদের চোখের উপর দিয়েই ভিন গাঁয়ের একজনকে পছন্দ করে বসল!'

'ফা বুড়ো, হা, হা!'

'হুঁ! কি এক ... ফা বুড়ো!'

এই সব মন্তব্য বিধবা ওয়াং-এর কানে যাচ্ছিল না বলেই মনে হল, কেন না, দেখা গেল হাসিমুখেই সে সকলের খাওয়ার তদারকে মনোযোগ দিয়ে চলেছে। সে একবারও ক্ষোভ প্রকাশ করল না। কিন্তু আ আও সবই শুনতে পেল এবং কাঁপতে কাঁপতে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। তার তখনকার মনের ভাবটা কি

অপমান, না আতঙ্ক, রাগ, না একটা গুরুভার বিষণ্ণতা—কিছুই সে বুঝতে পারল না বটে কিন্তু তার মনে হল, একটা জগদ্দল পাথর যেন তাকে পিষে ফেলছে এবং হৃদপিণ্ডটা যেন উত্তপ্ত একটা লৌহশলাকায় বিদ্ধ হয়ে গেছে। দিন কয়েক আগেও সে সাহসের সঙ্গে অদৃষ্টের উপর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু এখন সে শুধু হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেবলই হামাগুড়ি দিচ্ছে।

লম্বা-চুলো গ্রাম্যমোড়ল অবশেষে বলতে শুরু করল ঃ

'সত্যি কথা বলতে গেলে,' সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'এ ব্যাপারটা হয় তো তেমন গুরুতর কিছু নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত কিশোরীর পক্ষে বিবাহটা কাম্য, এ কথা অস্বীকার করা চলে না, তাই নয় কি? কিন্তু চিরাচরিত বিধিব্যবস্থা অস্বীকার করে ... গোপনে সকলকার অজ্ঞাতে ... এক তরুণের সঙ্গে ... প্রেম করা—একে কোন মতেই মার্জনা করা যায় কি?'

ব্যবসাদার উ বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন! এ রকম শাস্তি ভোগ সেই সব মাকেই করতে হয় যারা গত জীবনে অনুরূপ পাপ কাজ করেছে। ভেবে দেখো, ওয়াং-গিন্নি, তোমার মেয়ে কেবল তোমাদের বংশকেই কলঙ্কিত করল না, সেই সঙ্গে মজাল—সমগ্রভাবে তাও গ্রামকেও। তুমি বেশ ভাল করেই জান যে, মৃত্যু ছাড়া চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণের আর কোন শাস্তি হয় না। আশা করি, পাথুরে দরজা গ্রামের চাও পরিবারের সেই মেয়েটার কথা তোমার বেশ মনে আছে। তিন-চার বছর আগের কথা—সে মেয়েটাও ওইরকম একটা অপরাধ করে ফেলে। তাকে মারতে মারতেই মেরে ফেলা হয়। বিনা কফিনেই তাকে কবর দেওয়া হয়, আশা করি সে কথাও ভুলে যাওনি। একে কেউ নিষ্ঠুরতা বলবে না, এ বিচার, ন্যায়বিচার;

সে মেয়েটা সমাজ-নীতিকে অস্বীকার করেছিল। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, তার পরেও কিন্তু সমাজকে কলঙ্কিত করা বন্ধ হয়নি। জীবননাশেই তাদের পাপের বিনাশ হয় না। ... মাকেও এর জন্যে দোষী হতে হয়। না, সত্যিই বিনাশ হয় না। আর আমরা সকলেই জানি যে মৃত্যুর পরেও কলঙ্কটা বেঁচে থাকে।'

'তুমি যা বললে তা এমন সত্যি যে, অস্বীকার করবার জো নেই। মৃত্যুতে মানুষের দুষ্কর্মের প্রবণতা নষ্ট হয় না। কিন্তু, অপর পক্ষে, মেয়েটাই একমাত্র অপরাধী নয়। ... মায়ের দোষও কম নয়ঃ কোন বিষয়ে শিথিলতা, নিয়ম মেনে চলায় গাফিলতি। আবার, এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, মা পূর্ব পূর্বজন্মে সবিশেষ ধার্মিক ছিল না।... ওয়াং-গিন্নি, তোমাকে সাবধান হতে বলছি। এ জন্মে তোমাকে আরও কঠোর হতে পরামর্শ দিচ্ছি।'

গ্রাম্যমোড়লের এই বক্তৃতার জবাবেও, আশ্চর্যের বিষয়, ওয়াং-গৃহিণী রাগ প্রকাশ করল না, বরং তাকে কথা বলতেই যেন উৎসাহিত করল। সে ভয়ে ভয়ে একটু এগিয়ে গেল, দু-হাতে ছেঁড়া জামার প্রান্ত দুর্বল হাতে দুমড়োতে লাগল।

মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বেদনা-কাতর কণ্ঠে সে নীচু গলায় বলতে লাগলঃ

'হাঁ ... মোড়লমশায় ... আপনি যথার্থই বলেছেন। আমার মেয়ে যে অপরাধ করেছে, তার জন্যে নিশ্চয়ই আমি দোষী। জানিনে পূর্ব-জন্মে কি অমার্জনীয় মহাপাপ করেছিলাম; কিন্তু করেছিলাম যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর আমার মেয়ে যে অপরাধ করেছে তাতে তার মৃত্যুই যথার্থ শাস্তি, আপনার এ কথাও খুবই সমীচীন। তবুও—' হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। 'আমি—আমি—আর কিছু

বলতে পারছিনে, কিন্তু বলবারও আমার মুখ নেই—কেবল আপনাদের করুণা ভিক্ষা করছি! অন্তত ওর জীবনটা ভিক্ষা দিন।'

দাবীতে দুঃসাহসের পরিচয় আছে, উপরোধেও অসামান্যতা আছে। এবং সেই মুহূর্তে যদি গ্রামবাসীরা তারই বাড়ীতে বসে তারই দেওয়া খাদ্যপানীয়ে ব্যস্ত না থাকত, তা হলে তার এই দুঃসাহসের জন্যে বিদ্রূপের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি ছিল না। বিচার অনুষ্ঠানে ছিল তাদের একটা আন্তরিক আস্থা, লেখাপড়া সম্পর্কে ছিল নীতিবোধ, কাজেই তারা বাজে কথা শুনতে মোটেই রাজী নয়। তবু এটা বোঝা গেল যে, তারা যখন এসেছে খেয়েছে, সকলেই বেশ উপভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে গেলে বিনা নিমন্ত্রণেই এসে হাজির হয়েছে তখন তারা একেবারে কঠিন হবে না। কিন্তু তাদের সকলের সিদ্ধান্তই নির্ভর করছে বড়লোক চিন, ব্যবসায়ী উ, আর লম্বাচুলো গ্রাম্যমোড়লের মতামতের উপর। সকলেই চিনের কথা শুনবার জন্যে নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগল। অবশেষে চিন শুরু করলেন :

'উ যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত, তাঁর কথা জ্ঞানী লোকের কথা, সুতরাং বাহুল্যবর্জিত। মৃত্যুর পরেও পাপের অস্তিত্ব থাকে, অর্থাৎ কলঙ্ক কখনও যায় না। ঠিক কথা! কাজেই, আমার মনে হয়, মেয়েটার জীবন নিলে লাভ বিশেষ কিছুই হবে না। অপরাধ স্বীকার হয়েছে এবং মেয়ের মা, বিধবা ওয়াং দয়া ভিক্ষা করে তার স্বামীর মুখ রক্ষা করতে আমাদের কাছে আবেদন করছে। তার ইচ্ছা, মেয়ের জীবন রক্ষা করি। সব কিছু বিবেচনা ক'রে আমার মনে হয়, আমাদের পক্ষে তার প্রার্থনা পূরণ করা অসম্ভব কিছু একটা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তার

মেয়ের মত একটা কুলটা মেয়েকে গ্রামে বাস করতে দেওয়াও কলঙ্কের বিষয়। সেটাও আমরা কোন মতেই পারিনে। অতএব, তাকে অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।'

মোড়লও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। যদিও তাতে আমাদের সম্মান বাড়বে না, তবুও ওকে হত্যা করায় কোন লাভ নেই। ... বরং আপনি যা বলছেন—ওকে অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে—এ প্রস্তাবটি অত্যন্ত সমীচীন!'

এ দু-জন যে রায় দিলেন, তারপরে বাকী কয়জন (তারা নিজেদের জুরী হিসেবে গণ্য করে) নিজ নিজ মুখে লাগাম এঁটে দিল। এঁদের দু-জনের রায়ই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ওয়াং-গৃহিনীর শ্রান্ত পাণ্ডুর মুখে এবারে সত্যিকারের হাসি ফুটে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ গ্রামের এই তিন জ্ঞানীব্যক্তির সামনে নতজানু হল এবং স্বয়ং-নির্বাচিত জুরীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে আ আও সব শুনেও, আশ্চর্যের বিষয়, এই দাক্ষিণ্যে এতটুকু খুশি হতে পারল না। তবে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল যে, তার জীবনটা অপ্রত্যাশিত-ভাবেই রয়ে গেল। মৃত্যুটা যে কত ভয়ংকর, তার সম্যক ধারণা ওর এ বয়সে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যখন শুনল যে ওকে গ্রাম থেকে নির্বাসিত করা হল, আর কখনও গ্রামে এসে পরিজনদের দেখবার কোন আশাই রইল না, তাকে এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে, তখন তার বুঝতে বাকী রইল না যে, সেটা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। দুঃখে বেদনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, যেন সেটা আর আস্ত নেই, একটা স্তূপ, অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দুই

মাস দুই আগে এপ্রিলের প্রথম দিকেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। সে দিনটা ছিল অনির্বচনীয় কোমলতায় ভরপুর। একটা অসহ ক্লান্তি ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। এরকম অবস্থায় মানুষকে করে তোলে স্বপ্নালস, নিদ্রাতুর, যেন কোন অলৌকিক মদ্যপানে বিভোর।

সেদিন বিকেলের দিকে আ আও পাশের ইউ গ্রাম থেকে বাড়ী ফিরছিল। তার মনে হচ্ছিল এমন উজ্জ্বল দিন সে আর কখনও দেখে নি। তার সর্বাঙ্গে যেন একটা নতুন রকমের উষ্ণতা সে অনুভব করল, সেটা এমন একটা অদ্ভুত শক্তি যাতে তার মনে হল, সে যেন এইমাত্র নবজীবন শুরু করেছে। রাস্তার দু-পাশের মাঠে হলদে ঝরাপাতাগুলি যেন দেখতে দেখতে ঘন সবুজ পাতায় রূপান্তরিত হল, গাছগুলিতে যেন নবজীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে এবং গাছের শাখায় শাখায় নব কিশলয়ের পাশে পাখীরা সানন্দে কলধ্বনি করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে, যতদূর দৃষ্টি যায়—সর্বত্র সব কিছুই সবুজ, তাজা, বাড়বাড়ন্ত, সবে জেগে উঠে কি যেন প্রত্যাশা করছে। যা-কিছু সে দেখছে, সব কিছুর সঙ্গেই যেন একটা ঐকতান, সব কিছুই যেন প্রত্যাশাপূর্ণ। কিন্তু কিসের প্রত্যাশা? সে জানে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল যে, তার গতি মন্থর হয়ে আসছে। দেহের ভিতরকার উত্তাপে তার মুখখানি যেন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তখুনি সে তার দেহ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। তার সর্বাঙ্গে যেন রক্তকণিকা ছুটাছুটি করতে শুরু করল।

'আ আও!' কোথা থেকে কে যেন ওকে ডেকে উঠল।

আশ্চর্য ও কিছুটা ভীত হয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে চার দিকে, মাঠের দিকে উঁকি দিয়ে, পার্বত্য উপত্যকার পাইনগাছের সারির

দিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। মাথার উপরে বাজ পাখী বৃত্তাকারে উড়ছে। লজ্জায় তার মুখখানা লাল হয়ে উঠে, সূর্যতাপে উত্তপ্ত গাল ছুটি আপন মনেই ছু-হাতে ঘষল, তারপর এগিয়ে চলল।

'আ আও!' কে যেন একজন চেঁচিয়ে উঠল। এবারে আরও কাছে। কি করবে স্থির করতে না পেরে সে থামল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কাজেই আবার সে চলতে শুরু করল। ঠিক তখনি আবার সেই কণ্ঠস্বর। এবার আরও কাছে। শুনতে পেল ঃ

'আ আও! আমি।'

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেল একটা ঝোপের ভিতর থেকে একটা মাথা বেরিয়ে আসছে। তারপর আস্তে আস্তে একটি তরুণ বেরিয়ে এল। তার গায়ে লম্বা জামা, এখন তার পা থেকে ম্যাথা পর্যন্ত সবটাই দেখা গেল। মাথায় লাল বোতামওয়ালা একটি সুন্দর টুপি। বয়স হয় তো তার বছর বিশেক হবে, দেখতে কুৎসিত নয়, মুখে একটি প্রসন্নতার হাসি। আ আও তাকে চিনতে পারল, পাশের গ্রামের দোকানী লী-র পুত্র। আ আও ছেলেটির নাম জানে। তার নাম আ সিয়ান।

'এই যে, তুমি!' আ আও বলে উঠল। 'বাপরে, কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। কোত্থেকে এলে তুমি?'

ছেলেটির হঠাৎ আবির্ভাবে আ আও যে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েছে তা অবশ্য মনে হল না।

'আমাকে বলছ?' সে জানতে চাইল। 'আমি?—আমি সবে শহর থেকে আসছি। দূর থেকেই তোমাকে দেখতে পেলাম এবং তোমার সঙ্গে একটু মজা করবার জন্তে লুকিয়ে ছিলাম।'

'ওমা, কি বেহায়া ছেলে গো!' উচ্ছলিত হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, হাত তুলে এমন ভাব দেখাল যেন সত্যি সে বেহায়া ছেলেটার গালে একটা চড় কসিয়ে দেবে। 'ভয় দেখিয়ে মানুষকে মেরে ফেলতে চাও!'

'ক্ষমা করো আ আও, সত্যি আমাকে ক্ষমা করো। আসল কথা, তোমাকে একটা কাজের কথা বলবার আছে।'

'যথা ?'

কিন্তু তরুণ ছেলেটা হঠাৎ যেন কেমন দুর্বল ও লাজুক হয়ে পড়ল। আমতা আমতা শুরু করে দিল, 'আমি—আমি—' ধাঁ করে কিশোরীর হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলল।

'এ কি ?' তাড়াতাড়ি আ আও এক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত কারণে তার পা দুখানি আর নড়তে চাইল না। শরীরটা কেঁপে উঠল, যেন একটা আঘাত পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল যে, তার জামার আড়ালে বুকের ভিতর কি একটা সড়্ সড়্ করে উঠল। দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষে উবে গেল। কোমরে জড়িয়ে ধরে ছেলেটা তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। একটু পরেই তাকে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করল। আ আও কিন্তু বাধা দেওয়ার কোন রকম চেষ্টা করল না। তার মনটা যেন বিকল হয়ে গেছে। তারা যে চলছে, এ ধারণাটাও আ আও হারিয়ে ফেলল। আর তা ছাড়া, সে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। সে শুধু এইটুকু জানে যে, ভিতরে ভিতরে একটা অসহনীয় তৃপ্তি ও সেই সঙ্গে গর্বও কিছুটা অনুভব করল।

ঘন পাতায় ছাওয়া একটি গাছের ছায়ায় আ আও তরুণের কাঁধে হেলান দিয়ে বসল। তার চোখ দুটি নিমীলিত, দ্রুত স্পন্দন-দেখা দিল। বুকের যেখানটায় স্পন্দিত হচ্ছিল সেখানটায় একখানি পেলব

হস্তের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করল। তরুণের ওষ্ঠ তরুণীর ওষ্ঠের স্পর্শ লাভ করল। হঠাৎ আ আও এমন একটা দৈহিক উদ্দীপনা অনুভব করল যে, সেরকমটা আর কখনও করে নি।

'ক-অ-অ-অ !'

মাথার উপর ঘুরপাক খেয়ে একটা দোয়েল আ আওকে চমকে দিল এবং মুহূর্তের জন্যে সে জগতের অস্তিত্বই ভুলে গেল। সে কাঁপতে লাগল।

'আ সিয়ান! না না! দোহাই তোমার, ও নয়! মা আমাকে খুন করে ফেলবে!'

'ও নয় কেন? ভয় কি! আমাকে বিশ্বাস কর, আমার উপর নির্ভর রাখ। সব কিছুই হবে বিস্ময়কর, সব সময়—ঠিক এমনটি।...'

আ সিয়ানের স্বরও কেঁপে কেঁপে উঠল। সে স্বরের একটা অপূর্ব মূর্চ্ছনা আ আওকে এমনভাবে আহ্বান করল যেমনটি সে আর কখনও শোনেনি। আর এ একথাও অস্বীকারের জো নেই যে, এরপর সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তরুণ ওর হাতে মুখের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। কিশোরী নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

তিন

সে দিন খুব বিলম্বে মেয়ে ঘরে ফিরতেই তার উত্তেজিত শ্রান্ত বিস্রস্ত মূর্তির দিকে চেয়েই মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হয়েছে আ আও? কি, জ্বর হয়েছে? আয় তো কাছে, দেখি।' কপালে হাত দিয়ে দেখল, একগোছা চুল এসে কপাল ঢেকে দিয়েছে, যথাস্থানে চুলের গোছা বিন্যস্ত করে দিতে দিতে আবার শুধাল, 'ঠাণ্ডা লেগেছে?'

'কই, কিছু না। আমার—আমার কিছু ভাল লাগছে না।' আ আও বিড় বিড় করে অর্ধ স্বগত জবাব দিল। বিছানায় গিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। সে বেশ জানে যে কি ঝক্কি, কি বিপদ, কি ভাগ্য তার সামনে ওৎ পেতে আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও ভাল করেই জানে যে, আ সিয়ান নিশ্চয় ওর সঙ্গে দেখা করবে, ইচ্ছা হলেই আসবে, এমন কি, হয় তো কালই এসে পৌছবে।

একটা সাংঘাতিক কিছু যে ঘটবেই সেটা ও প্রত্যাশাই করছে; তার জন্যে ও নিজেকে প্রস্তুত করেছে। হয় তো এখুনি কেউ এসে তাদের দুষ্কার্যের জন্যে ওকে প্রকাশ্যভাবে গালাগালি করবে, ওকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবে, কিন্তু কেউ এল না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে ওদের দুষ্কার্য ধরা পড়বেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সান্ত্বনাও ওর ছিল যে, যত বিপদই আসুক না, ওর প্রণয়ী এসে ওকে রক্ষা করবেই এবং দু-জনেই সে অপরাধের শাস্তি প্রসন্নমনেই ভোগ করবে। ও আপনার মনেই কল্পনায় দেখল যে, আ সিয়ানের সেই কলঙ্কে, ম্রিয়মাণ-মুহূর্তে ও গিয়ে গর্ব-ভরে তার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং এক সঙ্গে অদৃষ্টের দেওয়া দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে। অবশ্য ও যেটা সব চেয়ে বেশী ভয় করেছিল সেটাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। কিন্তু নিজের মনে প্রেমের যে বিচিত্র রঙিন স্বপ্ন ও দেখেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের এতটুকুও মিল রইল না। ঘটনাটা ঘটে ওয়াং-এর ভোজদানের ঠিক তিন দিন আগে।

পর্বতটার আড়ালেই ছোট একটা পাহাড়, নামটা কারুর মনেই হয় না। পাহাড়ের উপরাংশ গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে আছে। সেখানে একটি মন্দির আছে কিন্তু পূজার্থীর সমাবেশ হয় না বললেই চলে। এমন কি, পাহাড়টার উপরে কেউ ওঠে না পর্যন্ত। তবে

পাথর-কাটরা গ্রামে সোজা পথ ধরতে হলে সময় সময় কেউ কেউ পাহাড়ী-পথটি ধরে যায়। পার্শ্ববর্তী অরণ্যটি কোন এক বড় জমিদারের সম্পত্তি। এমন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে খুব কম লোকেই সাহস পায়। জায়গাটা এমন নিবিড় নিস্তব্ধ যে ভয় করে, তবে তরুণ-তরুণীর প্রেম-নিবেদনের পক্ষে উত্তম আশ্রয়।

সে দিন লাও তে নামক এক কাঠুরে জ্বালানি কাঠ চুরি করার উদ্দেশ্যে জঙ্গলের মধ্যে চুপি চুপি এসে ঢুকল। লোকটার মুখে অনেক দাগ। এক বোঝা শুকনো কাঠও সে সংগ্রহ করল এবং মনে মনে ঠিক করল যে, সূর্যদেব মন্দিরের পশ্চিমে· হেললেই কাঠ নিয়ে চলে আসবে। পশ্চিমাকাশের দিকে নজর পড়তেই সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, এক পাশে বোঝাটি রেখে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মাটিতে বসে পড়ে সে ধূমপান শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না? তামাকের নলটা ট্যাকে গুঁজে কুড়ুলখানি হাতে তুলে নিল—তার ধারণা, কোন বন্য পশু আসছে, কাজেই সে তৈরি হয়েই দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত দারুণ উত্তেজনায় কাটল। একবার ভাবল পালিয়ে আসবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভেবে দেখল যে, পালিয়ে না এসে নিজেই প্রথম আক্রমণ করবে। তাই যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল সেই দিক লক্ষ্য করে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা সে প্রাণপণ শক্তিতেই ছুঁড়েছিল।

অবাক কাণ্ড, ঝোপের ভিতর থেকে যে বেরিয়ে এল সে বন্য পশু নয়, একজন মানুষ। লোকটি কোন দিকে না তাকিয়ে দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল। লাও-তে অবশ্য তাকে আ সিয়ান বলেই চিনতে

পারল। প্রথমে সে থতমত খেয়ে গেল, তারপর যেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল সেই ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল।

কাছে যেতেই সে দেখতে পেল, আ আও ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের জামা-কাপড় শিথিল, মাথার চুলে সবুজ পাতার টুকরো জ্বল্ জ্বল্ করছে ; চোখে মুখে একটা পাপাসক্তির লক্ষণ। দৃশ্যটি লাও তের মনে একটা দারুণ ক্রোধের সঞ্চার করল। সে রাগে কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সে আ আওকে বেদম প্রহার করতে শুরু করল।

'হুঁঃ। তোর পেটে পেটে এত শয়তানী ! বাঃ, চমৎকার !'

আ আও টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করল না, বরং করুণ দৃষ্টিতে দয়া করবার জন্যে মিনতি জানাল। 'বেহায়া, কলঙ্কিনী ! গোপনে এসে এখানে আ সিয়ানের পাশে শোয়া !' সঙ্গে সঙ্গে আবার ভীষণ ভাবে কিলচড় মারতে লাগল।

একটু পরেই এই দৃশ্য ও ক্রোধোন্মত্ত লাও তে-র গালাগালি, প্রহার —সব কিছুই ওর মন থেকে মুছে গেল। কেমন করে কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে আ আও বাড়ী ফিরল, সে সব কিছু আর ওর মনে নেই। ওর এই প্রেমের কাহিনী কেমন করে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল তাও ওর মনে নেই। ও বাড়ীতে পৌছতে না পৌছতেই যার দিকে চায় তার চোখে মুখেই দেখে একটা দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি। এমন কি, মায়ের দৃষ্টিতেও একটা অপরিসীম রোষ ও তিক্ততা ফুটে আছে। সে দৃষ্টির গভীর অতলে একটা তীব্র মনঃপীড়া দেখা দিয়ে তাকে বিমর্ষ করে তুলেছে। কিন্তু বাঁশের লাঠির ক্রমাগত বর্ষণ, কুৎসিত গালাগালি—এর কিছুতেই ওর এতটুকু বেদনাবোধ বা লজ্জা হল না, এমন কি, এতটুকু দুঃখও না।

এ সবই ও প্রত্যাশা করেছে, পেলও। এসব কিছুই আকস্মিকতার ফল নয়, নির্মম অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী ফল। আর যা-কিছু ঘটল তার সব কিছুর জন্যে ও প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটি মাত্র ব্যাপার ঘটল যেটি সত্যই ছিল ওর কাছে অপ্রত্যাশিত এবং যার ফলে ও ভয় বিহ্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। এত বড় একটা ব্যাপারে আ সিয়ান (যাকে ও অন্তর দিয়েই ভাল বেসেছিল, বিশ্বাস করেছিল) এতটুকু দুঃখও ভোগ করল না, এমন কি, ওর এত বড় বিপদে এত বড় দুঃসময়ে একবার ওর পাশে এসে দাঁড়ানটাও প্রয়োজন মনে করল না।

চার

একটা দুঃস্বপ্নের মতই তিন তিনটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড হবে না; এ সংবাদে সে কতকটা স্বস্তি পেল; কিন্তু তবুও যেন সে অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। মনে হয়, দেহটা স্থবির হয়ে এসেছে, দেহের গুরুভার ও অপরিসীম ক্লান্তিতে ওর সবটুকু কর্মশক্তি যেন নিঃশেষে চুরমার হয়ে গেছে। ওর প্রতি কোন অন্যায় আচরণ বা কটূক্তিতে যে এই ভাঙন ধরেছে, তা নয়; মায়ের চোখে যে দুঃখের ছবি দেখেছে তাতে ও ভেঙে পড়ে নি; ও শুধু আহত হয়েছে ওর প্রণয়ীর একান্ত দায়িত্বহীন ও কাপুরুষোচিত আচরণে।

পুরুষ অতিথিদের মদ্যপান শেষ হবার আগেই মেয়েরা পানাহারের জন্যে এসে জমতে শুরু করেছিল। আ আও তখন নির্জন কোণটিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আনমনে কি ভাবছিল। সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, সারা দেহ কাঁপছে—শীতে নয়, বা মৃত্যুভয়েও নয়; কি একটা অজানা বিষণ্ণতা যেন ওর সমগ্র সত্তাটাকে আঁকড়ে ধরেছে। পুরুষগুলির

তুলনায় মেয়েরাও কেউ কিছু কম খেল না। সকলের খাওয়া যখন শেষ হল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে, তারা একে একে বাড়ী ফিরতে লাগল। ফিরবার সময় পুরুষদের মতই মেয়েরাও এক একটি শাণিত্ তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করে গেল যার প্রত্যেকটি কথা নির্মমভাবে ওকে, ওর মাকে বিদ্ধ করে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় এক একজন যেমন রাশি রাশি খাদ্য উদরস্থ করে গেল, যাওয়ার বেলায় তারা বিষও উদ্গীরণ করে গেল সেই পরিমাণ।

সমস্ত আবহাওয়ায় যেন একটা চরম নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল। আ সিয়ানের মা শ্রীমতী লী হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভোজের আসরে এসে উপস্থিত হলেন। এ কথা বুঝতে মোটেই বিলম্ব হল না যে তাঁর পুত্রের কৃতকর্মের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইতে আসেননি। বরং এসেছেন বিধবা ওয়াংকে গালাগালি করবার জন্যে। আ সিয়ানকে অসৎ পথে টেনে আনবার সুযোগ কেন সে তার মেয়েকে দিয়েছে! বাড়ী ঢুকবার আগে থেকেই সে গালাগালি শুরু করল। তাঁর বিপুল দেহটা দূর থেকে দেখেই ওয়াং শঙ্কিত মনে তাঁকে আহ্বান করবার জন্যে এগিয়ে গেল। লী-গৃহিনী তখন পাথরের সাঁকোটা পার হয়ে ওয়াং-এর দরজার সম্মুখে এসে পড়েছেন। মন্দভাগিনী মেয়ের মাকে সামনে দেখেই লী-গিন্নী কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তারপর চড়া গলায় শুরু করল ঃ

‘হতচ্ছাড়ি মাগি! যেমন মেয়ে, তার মাও তেমন! আমাকে অভ্যর্থনা করবার দুঃসাহস তোর হল! তাই নাকি! ছেলে আমার নিষ্পাপ, শুদ্ধ, সৎ; কনফুসিয়াস-এর মূর্তির সামনে সে প্রার্থনা করেছে আর, শাস্ত্রের কথা সে বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করেছে। আর তুই, বেহায়া মা—আর তোর অসতী মেয়ে, তাকে অসৎপথে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ করতে চাস্। এই মুহূর্তে আমিও তোদের সঙ্গেই মরব!’

এই কথা বলেই সে সত্যসত্যই বিধবা ওয়াং-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন তার মাথায় নিজের মাথা ঠুকে দিতে কৃতসংকল্প। অন্যান্য মেয়ে-অতিথিরা তাদের দু-জনকে ঘিরে দাঁড়াল। এ দৃশ্য দেখে তারা যেন প্রসন্নই হয়ে উঠল। লী-গিন্নীর ক্রোধ তাতে কতকটা প্রশমিত হল। অথচ ওই স্থূলকায়া রমণীটি এতক্ষণ বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, তার সম্মতি-ক্রমেই মেয়েরা পূর্বে এ বাড়ীতে প্রবেশ করেছে। অগত্যা সেও নিজে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করল, তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে মাঝে মাঝে বলতে লাগল, 'মাগী আমার ছেলেটাকে অপমান করেছে, তার চরিত্র নষ্ট করেছে ... এখন থেকে সে আর সকলের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

শেষ অতিথিটি যখন বিদায় হয়ে গেল তখন বৃদ্ধা ওয়াং একটি তেলের প্রদীপ হাতে নিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্যে আ আওকে ডাকলে। কিন্তু সারাদিন অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থেকে আ আও-র শরীরের অবস্থা এত বিকল হয়ে পড়েছে যে, উঠে দাঁড়াবার মত শক্তিও যেন তার নেই। এক মুহূর্ত আগেই সে অনুভব করছিল প্রচণ্ড ক্ষুধা, কিন্তু এখন আর এক গ্রাস খাদ্যও গিলবার শক্তি তার নেই।

মধ্য রাত্রি। বিধবা ওয়াং তখনও শোয় নি। ছোট ঘরখানির মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এখানে ওখানে যে সব জিনিস ছড়িয়ে আছে তাই থেকে একটি দুটি করে গুছিয়ে নিয়ে একটা থলির মধ্যে রাখছে। অতি ভোরেই আ আওকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ওয়াং একটি একটি করে গুছিয়ে দিচ্ছে। জিনিসগুলি ভরতি করে থলেটাকে সে সযত্নে বন্ধ করল। আবার কি ভেবে সেটা খুলে আর এক জোড়া মোজা তার ভিতর পুরে দিল। এক

মুহূর্ত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে কি ভেবে নিল, তারপর একটা ভাঙা কাঠের বাক্স থেকে সূতীর স্কার্ট বের করল। এইবার তার মনে হল যে, পথযাত্রীর প্রয়োজনীয় সব জিনিসই দেওয়া হয়েছে।

বসন্তের রাত্রি, দেখতে দেখতে প্রভাত হল। অল্পক্ষণ পরেই মোরগ ডাকতে শুরু করল। বিধবা তার পুত্র ও কন্যার ঘুম ভাঙাল। একটি লণ্ঠন জ্বেলে কিছু খাবার তাদের সামনে ধরে দিল। তারপর, আ আও-র সঙ্গে সঙ্গে সেও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

'বুঝেছ মা, আমি তোমাকে ছাড়তে চাই নি! তুমি নিজে নিজের জীবন নষ্ট করেছ—'

বৃদ্ধার অর্ধনমিত দেহ কান্নার বেগে কেঁপে উঠল। তবুও সে যেন বাতাসে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। প্রাণপণ শক্তিতে মুখের মৃদু হাসিটুকু বজায় রেখে বলে, 'সাবধানে থেকো মা আ আও, এখন থেকে শক্ত হয়ে তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাকে আর কোন দিনই তোমার জন্যে দুঃখ পেতে হবে না। আমার কথা ভেবো না, মনে করো আমি মরে গেছি, এ পৃথিবীতে আমি আর নেই। এখানে যদি আমাদের দু-জনের দেখা না হয়, মরবার পর আবার দেখা হবে ... যেমন করেই হোক, দেখা হবে—সে আশাই করব।...'

ঠেলাগাড়ীতে উঠে ওয়াং ও আ আও পাশাপাশি বসল। ওর ছেলে গাড়ীখানি ঠেলে নিয়ে চলল। বাড়ী থেকে প্রায় আধমাইল দূরে—বৃদ্ধ ওক গাছটির কাছে, বড় রাস্তায় এসে যখন ওরা পৌছল, তখন ওয়াং গাড়ী থেকে নেমে, মেয়েকে শেষ বিদায় জানিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইল, যতক্ষণ না লণ্ঠনের আলোর শিখাটি দেখতে দেখতে সীমাহীন অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল—জীবনের শেষ শিখাটি যেন মৃত্যুর অতলস্পর্শ এক শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

দাইরেন মারু জাহাজে

বন্ধুবর আমাদের দাইরেন মারু জাহাজে তুলে দিতে এলেন, কিন্তু বিদায়-সম্ভাষণ না করেই স্থানত্যাগ করলেন।

কেবিনে ঢুকে তার আবহাওয়াটা ধাতস্থ করবার আগেই দেখতে পেলাম আমরা পরিবেষ্টিত।

বিছানা পাতবার উদ্যোগ আয়োজন করছিলাম।

'কোথায় যাবে তোমরা?' বেঁটে মোটা একটা লোক এসে প্রশ্ন করল। তার পিছনে আরও চারজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দুজনের পরনে পুলিসের উর্দি, হাতে পিস্তল, আর দু-জনের সাদা জামা-কাপড়।

'সিঙতাও যাচ্ছি।'

অপ্রত্যাশিত না হলেও বুকটা আমার ঢিব্ ঢিব্ করে উঠল। আমার বিশ্বাস ছিল, খানাতল্লাসীটা খুব কঠোর হবে না। একবার শেষ হলেই সঙ্গে সঙ্গে সাগরের আড়-পারে আমার প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। আর সেখানকার সব কিছুই আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

তারা হাত ও চক্ষুর সাহায্যেই অবশ্য আমার দেহ তল্লাস করল এবং ক্ষুধার্ত কুকুরের মতই আমার তল্পিতল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্ত্রী সদ্য কঠিন পীড়া থেকে উঠেছেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি। তার কোটরগত চোখ দুটিতে একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। আমরা যেন কোন এক দৈত্যের মুখের কাছে আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্যে জুয়া খেলায় মেতে উঠলাম।

'কোথেকে আসছ?'

'——থেকে।'

দেহের টগবগ করা রক্তপ্রবাহ সংযত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

'সেখানে কি করতে?'

'—সদর ঘাঁটিতে কেরানিগিরি।'

জানতাম সেখানে এক বন্ধু কাজ করে, তাই তার পেশাটাই আমার বলে চালিয়ে দিলাম। আসলে বলতে গেলে দীর্ঘকাল ধরেই ছিলাম বেকার, ভিক্ষুক বললেও বেশী বলা হয় না।

'মুনিবের নাম, তাঁর সদর দফ্তর, বংশের নাম, অফিসের পদ, বয়স ইত্যাদি সব কিছু বলতে হবে।'

দেহের সমস্ত রক্তকণিকাগুলি যেন ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল, এবারে ফেটে চৌচির হয়ে পড়লেই হয়। তবু বললাম :

'তাঁর নাম ...; অফিসের পদ ... ; বংশ ...। এখন তাঁর ... বয়স প্রায় পঞ্চাশ।'

'কি বললে, প্রায় পঞ্চাশ ?'

লোকটার ক্ষুদে চোখ ছুটো দেখতে দেখতে চওড়া হয়ে গেল। এবং মুখের শিথিল পেশীগুলি দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে গেল।

দারুণ উৎকণ্ঠায় স্ত্রীর চোখদুটিও ডাগর হয়ে উঠেছে।

'আমাদের কর্তার বয়স গেল বছর ছিল পঞ্চাশ, এ বছর তাঁর একান্ন চলেছে,' জবাবে বললাম।

'বা, মন্দ নয়, তুমি তোমার উপর-আলার বয়সটাও ভুলে যাও দেখছি। আচ্ছা, সিঙ্‌তাও যাচ্ছ কেন বল ত ? আর এই মেয়েমানুষটিই বা কে ?'

বললাম, 'আমার স্ত্রী। বাড়ী যাচ্ছি।'

'তাহলে বলতে চাও যে, তুমি শানটুঙ-এর বাসিন্দা, তাই না ? কিন্তু তোমার কথা——' লোকটা বলতে শুরু করে।

'আমি মাঞ্চুকুয়োর অধিবাসী।' কথাটা বলে আবার চুপ করে গেলাম।

'তা হলে শানটুঙ তোমার দেশ কেমন করে হল ?' লোকটা প্রতিপ্রশ্ন করে।

'বাবা সেখানে থাকেন।'

'কি করে ?'

'ব্যবসা।'

'কিসের ব্যবসা ?'

'পোদ্দারের।'

'দোকানের নাম?'

'——'

'ঠিকানা?'

'——স্ট্রীট।'

'এখন বাড়ী যাচ্ছ কেন?' আবার কতকগুলি নতুন প্রশ্নের আভাস পাওয়া গেল।

'হালে বিয়ে করেছ?' তার চোখদুটো ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে লাগল। প্রথমে আমার, তারপর স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে আবার ফিরল। আমাদের দু-জনকে দেখে আমরা যে সদ্য বিবাহিত এবং মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে বেরিয়েছি, এমনতর ভাব কারু মনে জাগবে কি না সত্যই আমি তা জানতাম না।

'চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছ, না ছুটিতে যাচ্ছ?'

'ইস্তফা দিয়ে এসেছি।'

'তা হলে তোমার নামের কার্ড ও ইস্তফার সার্টিফিকেট দেখাও।' লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা বেশ মোটাসোটা। সে যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির তাতে সন্দেহ নেই।

'সে সব আমার কাছে নেই।'

গোটা কেবিনটায় থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। জাহাজের দু-পাশে সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, তার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। শেষ বসন্তের এক ঝলক সূর্যালোক কেবিনের মেঝের উপরকার মাদুরে এসে লুটিয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে ঘুলঘুলি দিয়ে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া ভিতরে আসছে।

জবাব দিলাম, 'ও সবের কোন প্রয়োজন আছে মনে হয়নি। তা ছাড়া, আপিসের উর্দিও আমার গায়ে নেই, নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য সে সব কাগজ-পত্রের আর প্রয়োজন আছে বলেও ভাবতে পারিনি।'

'না—তোমাকে দেখে তুমি যে বিশেষ ভাল লোক তাও তো মনে হচ্ছে না।' মোটা লোকটা তার দৃষ্টি দিয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল, তারপর চোখ দুটো ফিরিয়ে এনে আমার চোখের পানে তাকিয়ে রইল।

'তোমার চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাল লোক নও।—ভাল লোকের চোখ কখনও অমন হয় না।— —আমার সঙ্গে আসতে হবে।' কণ্ঠে তার আদেশের সুর ফুটে উঠল।

তা হলে দেখছি আমার চোখ দুটোই ওর অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল!

আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়েও ঘণ্টাখানেক ধরে প্রশ্নোত্তর চলল। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসল যে আমাকে তার সঙ্গে তীরে যেতে হবে— আরও পরীক্ষা দরকার। বেশ মনে আছে, একটা চরম নৈরাশ্য এসে আমাকে পেয়ে বসল। ও যদি আমাকে বন্দরের ফাঁড়িতে নিয়ে যায় তা হলে লাঞ্ছনার আর কিছু বাকী থাকবে না—হয় তো চাবুক মারবে, নয় তো জোর করে কেরোসিন অথবা মরিচ জল নাকের ভিতর চালান দেবে। তখন আর বাকী কিছু থাকবে না!

মানুষ যখন নিরাশ হয়ে পড়ে তখন সে শান্ত হয়ে যায়, কারুর বা সাহস বেড়ে যায়। আমিও এই লোকটার সঙ্গে জোর পায়ে হেঁটে চললাম। দরজার কাছে পৌছবার আগেই সে আমাকে থামতে বলল।

'না, ওদিকে নয়। ... এদিকে!' হাতের ইশারায় যে দিকটা দেখালে সেই দিকেই ফিরে চললাম। একবার মনে হল, ও হয়ত আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চায়। তা.হলে তো ভালই হয়। এক সঙ্গেই মরতে বা বন্দী হয়ে থাকতে পারব।

দেখলাম, স্ত্রীকে যারা তল্লাসী করছিল তারা সব চলে গেল। স্ত্রী ঘুলঘুলিতে ঠেস দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলাম, রোগে ভুগে ও কত কাহিল হয়ে গেছে। বেদনায় অন্তরটা টন্ টন্ করে উঠল।

'লটবহর সব নিয়ে এসো। তল্লাস করতে হবে।' লোকটা আদেশ করল।

সব কিছু নিয়ে এলাম। একটি মাঝারি গোছের স্যুটকেশ, একটি বেতের বাস্কেট। হাতে পিস্তল ও ব্যাটনধারী লোক দুটো ইতিমধ্যে আমাদের কাছে ফিরে এল।

মোটা বেঁটে লোকটা আমার প্রত্যেকটি শার্ট, প্রতি জোড়া মোজা, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। পুরানো জামাকাপড় যারা বেচাকেনা করে, বা যারা জামাকাপড় বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয়, ঠিক তাদেরই মত ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে পরীক্ষার কাজ চালাল। তবে এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই কিছু লাভ হল না।

তারপর একখানা চিঠির কাগজের প্যাডের প্রতিখানা আলাদা করে করে আলোতে পরখ করল। আমার মনে হল, তার নিষ্ঠা কুকুরকেও হার মানায়।

প্রত্যেকটি জিনিসই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হল। আমাকে আপেল খেতে দেখে সে মন্তব্য করে বসল।

'বড় যে একা একা খাচ্ছ!'

আমাদের কেবিন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়েও বার বার সে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল। তার সে দৃষ্টি যেন বলছে, 'আমার এখনও বিশ্বাস, তুমি লোকটা ভাল লোক নও।'

শিকলের ঝন্ ঝন্ কড়্ কড়্ শোনা গেল। বুঝলাম লস্করেরা নোঙর তুলছে।

সাগরের বুকে মনোমুগ্ধকর তরঙ্গমালা অবাধেই উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার দেহ মনে এমনি ভাবে খিল ধরে ছিল যে মনে হল, হাত-পা যেন শৃঙ্খলিত। আমরা নীরবে উভয়ে উভয়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমাদের দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল সাগর—অপরাজেয় সাগরের অপর উপকূলে।

রাত্রি যখন গভীর এবং ধারে কাছে কেউ নেই, তখন শুধু আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী, ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি। স্ত্রী নীচু কম্পিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'হ্যাগা, জাহাজটা কখন গিয়ে ভিড়বে?'

'কাল সকাল দশ-বারটার আগে ত নয়,' জবাব দিলাম।

আমি যখন ডেকের রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম তখন তার একখানি হাত আমার হাতখানিকে একটু ঠেলা দিল।

'যদি ...' উভয়েই আমরা চারিদিকে কেউ আছে কি না দেখবার জন্য ফিরে তাকালাম, কিন্তু আমরা ছাড়া সেখানে আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

'যদি ... যদি তারা আবার আমাকে হয়রান করতে আসে তো সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব।...বরং জলচর প্রাণীকে দিয়ে আমার দেহটা খাওয়াব।'

স্ত্রীর মুখখানা আরও ফ্যাকাশে মেরে গেল। 'ওকথা বলো না!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আবার ওকে দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসেছে।

অশান্ত ঢেউগুলো অবিরাম জাহাজের ধারে এসে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস আর এখন মৃদু নয়। আমরা কেবিনে ফিরে এলাম। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে আমি সাগরের আর্তনাদ শুনতে লাগলাম। অন্য একখানা মাদুরে ডাইনীর মত দেখতে এক বুড়ী নির্বিকার ভাবে অহিফেনের ধূম পান করছে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে দেখা গেল, সিঙতাও-এর সবুজ পাহাড়ের চূড়ো আকাশের কোলে ঝালরের মত শোভা পাচ্ছে। আমার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হল।

'ওই যে আমার জন্মভূমি!' আমরা উভয়েই যেন বিকারের ঘোরে বলে উঠলাম।

মাটি

সারা রাত ধরেই মেশিনগান নেকড়ে বাঘের মত গর্জন করল।

ভোর হওয়ার কিছু আগে তিনখানি সাঁজোয়া গাড়ী ধরিত্রী দেবীর মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হল। এটি হচ্ছে গ্রামের একটি সামরিক সদর ঘাঁটির দফ্‌তর—অবশ্য সৈন্যদল যে কাদের তা কেউ জানে না! তিনখানা গাড়ী থেকেই কয়েকজন সামরিক পোশাকপরা সৈনিক লাফিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল। তাদের দেখে মনে হল, তারা যেন শ্রান্ত, নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে। তারা একটুক্ষণ বাদেই যখন আরও জন কয়েককে সঙ্গে নিয়ে

বাইরে বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল তারা বৃহৎ দুটো ভারী বাক্স বইয়ে নিয়ে আসছে। বাক্স দুটো গাড়ীর উপর তুলে দেওয়া হল, তারপর একে একে তারা গাড়ীতে উঠে বসল। দেখতে দেখতে ইঞ্জিন থেকে গাড়ী ছাড়ার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শুরু হল। একটু পরেই অসংখ্য পরাজিত সৈন্য জোয়ারের জলের মত এসে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রামের উপান্তে মাঝে মাঝে যে গুলি ছোঁড়া ছুঁড়ি চলছিল তা সাতটা পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। ভোরের আলোয় দেখা গেল তিনটি লোকের মৃতদেহ রাজপথে পড়ে আছে। একটা খাদ্যসম্ভারের দোকান আগুনে পুড়ছে। দোকানের দরজার ধারে একটি উলঙ্গ নারীর মৃতদেহ পড়ে আছে, তার মুখখানির রং শূয়োরের যকৃতের মত। একখানি পা কেটে ফেলা হয়েছে।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর তিন দিক দিয়ে কতকগুলি বিজয়ী সৈন্য ঝড়ের মত ছুটে এল। তাদের চেহারা পরাজিত সৈন্যদের চেয়েও ময়লা। তারা যেন আরও বেশী পরিশ্রান্ত বলে মনে হল। গ্রামের এখানে সেখানে তারা শান্ত্রী মোতায়েন করল, কিন্তু বেশীর ভাগই এগিয়ে চলল। কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ধরিত্রী দেবীর মন্দিরে এসে সেখানকার সরকারী পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলে সে জায়গায় সাদা কাগজে লাল হরফের ইশ্‌তেহার এঁটে দিল। মন্দিরের ফটকে চার জন সশস্ত্র শান্ত্রী মোতায়েন করা হল।

তারপর যা হল সে বড় চমকপ্রদ। জন কয়েক নিরস্ত্র সামরিক পরিচ্ছদ পরা লোক কতকগুলি কুঁড়ে ঘরে ইশ্‌তেহার বিলি করল এবং শ্লোগান-সংবলিত বিজ্ঞাপনীতে সারা গ্রামটা ছেয়ে ফেলল। তারা প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজার কড়া নেড়ে সকলকে বেরিয়ে আসতে ব'লল। খাকি-পোশাক-পরা একটি তরুণ-যুবক, মুখ-

খানি তার বিবর্ণ, গোল গোল দুটি চোখ, একটা টিনের চোঙা মুখে দিয়ে রাস্তার রাস্তায় চেঁচিয়ে কি বলে বেড়াচ্ছে।

ক্রমে বন্ধ জানলা ফাঁক করে একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে কতকগুলি রোদে পোড়া হলদে লোক চোখ পাকিয়ে উঁকি মেরে যে নতুন লোকটি বাড়ী বাড়ী কড়া নেড়ে বেড়াচ্ছে তাকে দেখতে লাগল। তাকে দেখে লোকগুলির মনে এই আশ্বাসই জেগে উঠল যে, যদিও তার পরনে বাঘের চামড়া তবু তার সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, বিশেষত তার আকৃতি দেখে তাকে বর্বর বলেও মনে হল না। এক-একজন করে পায়ে পায়ে গ্রামের লোকেরা তাদের জীর্ণ কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে যুবকটির কথাগুলো শুনতে লাগল, সে তখন চোঙার সাহায্যে খই ছুটিয়ে চলেছে, যেন অভিনয়ের বক্তৃতা চলেছে।

চোঙার ভিতর দিয়ে যে শব্দগুলি আসছিল সেগুলো বলা বাহুল্য, নতুন বলেই মনে হল—অন্তত একজন সৈনিকের কাছ থেকে তো নতুন বটেই। তার শেষ কথাটিই তারা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল। 'আমাদের দেখে ভয় পেয়ো না।' তারপর ইশ্‌তেহার, শ্লোগান-সম্বলিত রঙীন দেয়াল-বিজ্ঞাপনী তাদের প্রত্যেকের হাতে এক একখানি করে দেওয়া হল। তারা সেগুলি নিয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের নিরাশ করল।

হুয়াং লাও-তিয়ে ছেলে দুটিকে নিয়ে মাটির উনুনের পাশে নীচু গলায় কথা বলাবলি করছে। 'আহাম্মক! চীনদেশে আবার প্রজাতন্ত্র শাসন!' বুড়ো হুয়াং বিড় বিড় করে বলে:

'এটা চীন সাম্রাজ্যের চেয়ে এক চুলও ভাল নয়! ষোল বছর ধরে চলছে এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন যুদ্ধ-বিগ্রহ দিয়ে এর

যাত্রারম্ভ হয়। দিন দিনই অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়ছে এবং এ বছরটা যে আরও খারাপ যাবে তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি : বসন্ত কালে এল মার্শাল উ পেই ফু'র সৈন্যেরা, তারপর এল ফেং তিয়েনের লোক, আর এখন—' কিন্তু আর কিছু না বলে সে মুখ বন্ধ করল। ঘাড় বেঁকিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখল, যেন তার অভিযোগ কেউ আড়ি পেতে শুনে ফেলেছে। ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল।

মাটির দেয়ালে যে দুটি রঙীন কাগজ এঁটে দিয়েছিল, সে দুটির দিকে হুয়াং-এর নজর পড়ল। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে সে পড়তে চেষ্টা করল। একসময় সে লেখাপড়া শিখেছিল, বছর চল্লিশ আগে স্থানীয় সাহিত্য পরীক্ষায় পাশও করেছিল, তারপর সে শিক্ষকতাও করেছে। কাজেই সেই হরফগুলিও চেনে, কিন্তু এখানে যে কয়টি হরফ আছে তার মধ্যে কিছু নতুন জোড়াতালি দেখতে পেয়ে অর্থটা সে ঠিক ধরতে পারল না।

পুত্র লাও সানও বাপকে অনুসরণ করে লেখাটার পাঠোদ্ধারে মনোযোগ দিল। শুধু দুটো হরফ চিনতে পারল, 'চাষী' আর 'মিলিত', শেষোক্তটি চিনতে পারল এই কারণে যে, সকালে গ্রাম্য খাদ্যসম্ভারের দোকানটি পুড়িয়ে ফেলবার সময়ও 'মিলিত সম্পদ' লিখতে গিয়ে ওই হরফটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

পোস্টারটিতে কি লেখা আছে জানবার আগ্রহ হুয়াং-এর কনিষ্ঠ পুত্র লাও চি-রও কম ছিল না। তবে তার বর্ণপরিচয় ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই সে রাখালের কাজ করে আসছে, ঘাস কাটা ছাড়া আর কিছুই শেখবার সুযোগ পায়নি। পোস্টারে একটি আধুনিক তরুণীর ছবি আছে, সেটি তাকে মুগ্ধ করে ফেলল। মেয়েটির গায়ে হাত কাটা জামা। তার কোমর সরু, মুখখানি সুন্দর, দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো হুয়াং একটা কুৎসিত গালি দিয়ে উঠল, তারপর অর্ধ-স্বগত উক্তি করল, 'তার মানে, ওই সব চরিত্রহীন বেহায়া মেয়ের আমদানি চলবে!' সামনা সামনি দেখে বুঝতে পারল যে, ওই খোলা-হাত মেয়েটা আরও চার-পাঁচটা লোকের মধ্যে অমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে বন্ধুজনোচিত হাসি, দু-হাত বাড়িয়ে দুটি পুরুষের হাত চেপে ধরে আছে। এই একই সত্য জানতে পেরেই লাও সান বিস্মিত হয়ে পড়েছে কিন্তু এতে বাবার মত অসন্তুষ্ট হয়নি আদৌ। বরং এই বলে সে এই ছবিখানাকে সম্বর্ধনা জানাল যে, তার স্ত্রী গত বসন্তকালে মারা গেছে, সুতরাং এ ধরণের আধুনিক তরুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার পক্ষে তার কোন অন্তরায়ই আর এখন নেই।

'একটু আস্তে কথা বল বাবা, নইলে ওরা শুনতে পাবে। হুম্... তা ছাড়া, এ রকম বেহায়া মেয়ে আমদানির ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়। এতে আমাদের কোন ক্ষতিই নেই। আমাদের ঘরে তো একটি স্ত্রীলোকও নেই, কেমন, কি-না?'

কথাটা শুনে বুড়ো ছেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ভাব। তারপর লাও চি-র দিকে ফিরল। তাকে লক্ষ্য করে মহা-ঋষি কনফুসিয়াস-এর বাণী আওড়ে তার মাথাটা ঠাণ্ডা করে দিতে চাইল, কিন্তু লাও চি-র জন্যে তাকে চুপ করে যেতে হল। তারপর আর এ সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করল না, সকলেই মুখ ভার করে চুপ করে বসে রইল।

'খট্! খট্!' তারা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল, মাটির নীচের কুঠুরিতে গিয়ে পালাবে? তাদের নড়াচড়ার আগেই আবার দরজায় ধাক্কার শব্দ শোনা গেল, এবারে আরও জোরে শব্দ হল। লাও চি

হামাগুড়ি দিয়ে দরজায় ফাঁকে উঁকি মারল। দেখল, একটি ছোকরা সৈনিক, সঙ্গে তার সেই গাঁয়েরই লী দাঁড়িয়ে আছে।

তারা ভিতরে প্রবেশ করল, সেনানীর মুখে হাসি।

লী বুড়ো হুয়াং-এর সঙ্গে সেনানীর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'ইনিই হুয়াং লাও-তিয়ে, আমাদের মধ্যে একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক।'

'বেশ বেশ। তোমাকে একবার আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।'

হুয়াং লাও-তিয়ের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, জবাব দেওয়ার মত একটি কথাও খুঁজে পেল না।

বসন্তের দাগা মুখ লী বলল, 'সৈন্যাধ্যক্ষ মশায় গ্রামকে এমনি ভাবে গড়ে তুলতে চান যে, গ্রামবাসীরাই যেন গ্রামের যা-কিছু কাজ-কর্ম সারতে পারে।' সে আরও বলল যে, তাদের সাহায্য করবার জন্যে একজন লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজন! তার বগলে একতাড়া কাগজ ছিল, সেগুলি দেখিয়ে লী বলল যে, সেগুলি ছাপানো ইশ্‌তেহার, পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, চোখে কম দেখি, অক্ষরগুলো ভাল দেখতে পাইনে। আমি মোটেই কাজের যোগ্য নই।' হুয়াং প্রার্থনার সুরে জানাল, সে এসব কাজ থেকে সে দূরেই থাকতে চায়। কাজেই এ ব্যাপারের সঙ্গে কোন মতেই নিজেকে জড়াতে রাজী হবে না স্থির করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতেই হল। লাও সান বাড়ীতে বসে রইল, তাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। লাও চি নতুন কিছু একটা উত্তেজনামূলক দৃশ্য দেখার জন্যে উৎসুক, কাজেই স্বেচ্ছায় সে তাদের অনুসরণ করল।

অনতিবিলম্বে চাষীদের একটি সমিতি গড়া হল। সঙ্গে সঙ্গে হুয়াং,

লাও-তিয়ে একখানি খাতায় সভ্যদের নাম লিখে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার পাশেই বসেছিল সামরিক পোশাকে সতের বছর বয়স্ক এক তরুণ, হুয়াং তাকে উপরওয়ালা বলে সমীহ করে। নতুন যে বিধান আজ এখানে কায়েম হতে যাচ্ছে, এই ছেলেটিই তার উদ্যোক্তা। জমিদার ও যেসব চাষী নিজেদের কুঁড়ে ঘরে লুকিয়ে আছে তাদের সকলকেই ধরে আনবার জন্যে তার সমবয়সী তরুণদের সব গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়েছে। একে একে সকলকে ধরে এনে নবগঠিত সমিতির সভ্য করা হল।

লাও চি-র কাছে ব্যাপারটা ভালই লাগল, কিন্তু বারোয়ারি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অগত্যা সে এই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে, জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার এ একটা কৌশল মাত্র।

আপন মনেই সে মা তুলে গালাগালি দিয়ে উঠল।

মেশিনগান ছোঁড়া ও অজস্র গুলিবর্ষণ শব্দ দূরে সরে গেছে। গ্রামে প্রবেশের মুখে যে সৈন্যদল মোতায়েন ছিল তাদেরও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র চারটি শান্ত্রী ধরিত্রীদেবীর মন্দিরের ফটক পাহারা দিচ্ছে, মন্দিরের ভিতর আছে আরও দশ জন। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই নারী ও শিশুরা নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে সাহস পাচ্ছে।

'সমিতিতে যোগ দাও!' গ্রামে কতকগুলি লোক সমবেত হয়ে চীৎকার করতে লাগল।

একদিন পাঁচ-ছটি 'শিশু-সৈন্য' এসে উপস্থিত হল। অন্যান্য সৈনিক-দের মতই তাদেরও পরনে খাকি পোশাক। কিন্তু এখনও যাদের পূর্ণ বয়ক্রম হয়নি তাদেরই মত এদেরও গলার স্বর উঁচু। তারা সোজা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মেয়েদের খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে আগ্রহভরে আলাপ করতে লাগল।

সারা গ্রামে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। পরে জানা গেল যে, ওই সব 'শিশু-সৈন্য' আসলে পুরুষ নয়, মেয়ে! গ্রামের মেয়েদের জন্যেও একটা সমিতি করার উদ্দেশ্যেই তাদের আগমন।

হুয়াং লাও-তিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে ছেলেদের গালাগালি দিতে লাগল।

'ওই কচ্ছপের বাচ্চা লী, শালার মুখময় বসন্তের দাগ, ওই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া, আর তোরা দুটোয় মিলেই হয়ত তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে এই হাঙ্গামায় জড়িয়েছিস। পুরুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করা—সেটা ভালোই, কিন্তু তাই বলে তারা মেয়েদেরও সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়! এটা কি মেয়েদের সমাজতন্ত্রী করার প্রথম ধাপ নয়? আজ হোক, কাল হোক, সবই একদিন সাম্যবাদে রূপান্তরিত হবে। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, যদি তা-ই হয়, তা হলে আকাশ ভেঙে চৌচির হয়ে আমাদের মাথায় পড়বে। ভাবতে পারিস যে আমার মত একজন নিরীহ ভাল-মানুষকে এই পাঁকে নিয়ে ফেলা হচ্ছে। ভগবান আমাকে মার্জনা করবেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা?—তারা তো কখনই ক্ষমা করবে না!'

লাও সান হাঁ করল, কিন্তু টুঁ শব্দটিও করল না। লাও চি দেওয়ালে ঝুলানো হাত খোলা সুন্দরী মেয়েটির ছবিটার দিকে তেরছা দৃষ্টিতে তাকালো। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল—কেমন করে এতে সাম্যবাদের আমদানি হবে? সেদিন রাত্রিতে স্বপ্নে সে অনেক কিছুই দেখতে পেল।

গ্রামে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। জন কয়েক ছোকরা এখানে সেখানে খবর আনা-নেওয়ার জন্যে ছুটাছুটি করতে লাগল। লাও-চি সারাদিন নারী-সৈন্যদের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াল, একটা অদ্ভুত কোন ঘটনার আশায় সে উৎসুক হয়ে রইল।

লী-র বাড়ীতে গ্রামের সাত-আট জন ইতর লোক গিয়ে হাজির হল। দক্ষিণী সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যে তারা সকলে মিলে তাকে ভীষণ ভয় দেখাতে লাগল। 'ব্যাটা কচ্ছপ কোথাকার! তুই ব্যাটা শপথ করে বলেছিলি যে, এরা সাম্যবাদী নয়, কিন্তু এখন কি হচ্ছে একবার চেয়ে ছাখ্! মেয়েদের সংগঠিত করা! এ তো প্রথম ধাপ! তুই এর থেকে কত লাভ করেছিস? তোর তো নিজের স্ত্রী আছে; বেশ, তাকেই আমরা সবপ্রথম জাতীয় সম্পদভুক্ত করে নিচ্ছি।'

সত্যই লীর স্ত্রী আছে এবং তার মুখে বসন্তের দাগ নেই। সে বেচারী এদের কথাবার্তা শুনে শূয়রের খোঁয়াড়ে গিয়ে পালিয়েছিল, ভয়ে সে কাঁপছিল।

সেদিন বিকেলের আগে পর্যন্ত হুয়াং লাও-তিয়ের উর্ধ্বতন কর্মচারী শুনতে পায়নি যে, মেয়েদের জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনায় গ্রামে একটা বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তাই সে গ্রামবাসীদের সকলকে একটি সভায় ডেকে পাঠাল। সে নিজের খাটো ঘাড়টা যতটা সম্ভব বাড়িয়ে আধঘণ্টা ধরে গ্রামবাসীদের কাছে প্রাণ-পণে চেঁচাল। সে আশা করল যে, এর পর হয় তো আর ভুল বোঝার কোন কারণই রইল না: সাম্প্রদায়িক স্ত্রীর ধুয়াটা আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের একটা প্রচণ্ড মিথ্যাচার! একজন নারী-সৈন্যও বক্তৃতা দিল।

গ্রামবাসীরা সকলেই নিঃশব্দে বক্তৃতা শুনল। কিন্তু কোন রকম মন্তব্য করল না। দিব্যি বোঝা গেল, তারা তাদের কথা মোটেই বিশ্বাস করতে পারেনি, কেন না, বাড়ী গিয়ে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের দরজা বন্ধ করে দিল, এবং মেয়েরা আর একবার লুকিয়ে রইল।

একদিন দশ-বারজন শক্তিশালী গ্রামবাসী নিকটবর্তী জঙ্গলে মিলিত হল। প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে, বাতাস সূক্ষ্ম বালুকণা

স্তরে স্তরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, এক এক জায়গায় সেগুলি এমনি দেখাচ্ছে যেন কুকুরের জামা ছাড়িয়ে রাখা হয়েছে। দলের একজন, তার মুখখানা সরু, ডাকনাম 'জ্যান্তভূত', সে একটা গাছের গোড়ায় গিয়ে আসন গ্রহণ করল। উপরের দিকে তাকিয়ে সে রাগত স্বরে বলে উঠল ঃ

'তাদের এ সব প্রতিজ্ঞা, আমি বলছি, শুধু আমাদের ঠকাবার জন্যে! আমি তো এমন লোক কাউকে দেখলাম না যে, এক ছটাক জমি আমাকে দিল। আমরা যে সব জমি পাব বলে বলা হয়েছিল সেগুলির খবর কি? কখন পাব? কাজের বেলায় দেখবে, কুকুরের পেটে কচ্ছপের জন্ম হচ্ছে! আর সকলের মতই এরাও, তবে তফাৎ শুধু এদের সমিতি আছে, সভা আছে! ওদের চৌদ্দপুরুষকে ...! আজও যেমন প্রচণ্ড রোদে সারা গায়ে ঘাম নিয়ে আমরা এখানে মিলেছি সেদিনও তেমনি অবস্থাই থাকবে! আমাদের উপকার হবে সেইটুকুই!'

'ঠিক কুকুর-কচ্ছপ জাতীয় লোক তারা নয়', কে একজন বললে। 'তারা মন্দিরে বেশ মজা লুটছে, যথেষ্টই আছে। লাও-চি স্বচক্ষে দেখেছে। তারা যখন এত সব মিথ্যাচার করে তখন তাদের কথায় কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি?'

একজন ছোকরা চোখ দুটো সঙ্কুচিত করে বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল ঃ 'বেশ, তারা আগে একটা ঢালাও উৎসবের ব্যবস্থা করুক, তখন না হয় আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করব।'

আর একজন বলল ঃ 'যদি বহুনিষ্ঠ নারীই না থাকবে, তা হলে ওই পাঁচ-ছটা মেয়ে-সৈন্য তাদের সঙ্গে কি করতে আছে? এরা কি আর সব মেয়েদের বহুনিষ্ঠ করবার জন্যেই আছে? আচ্ছা, আমরাই যদি তাদের বহুনিষ্ঠ বানাই তাহলে কেমন হয়!
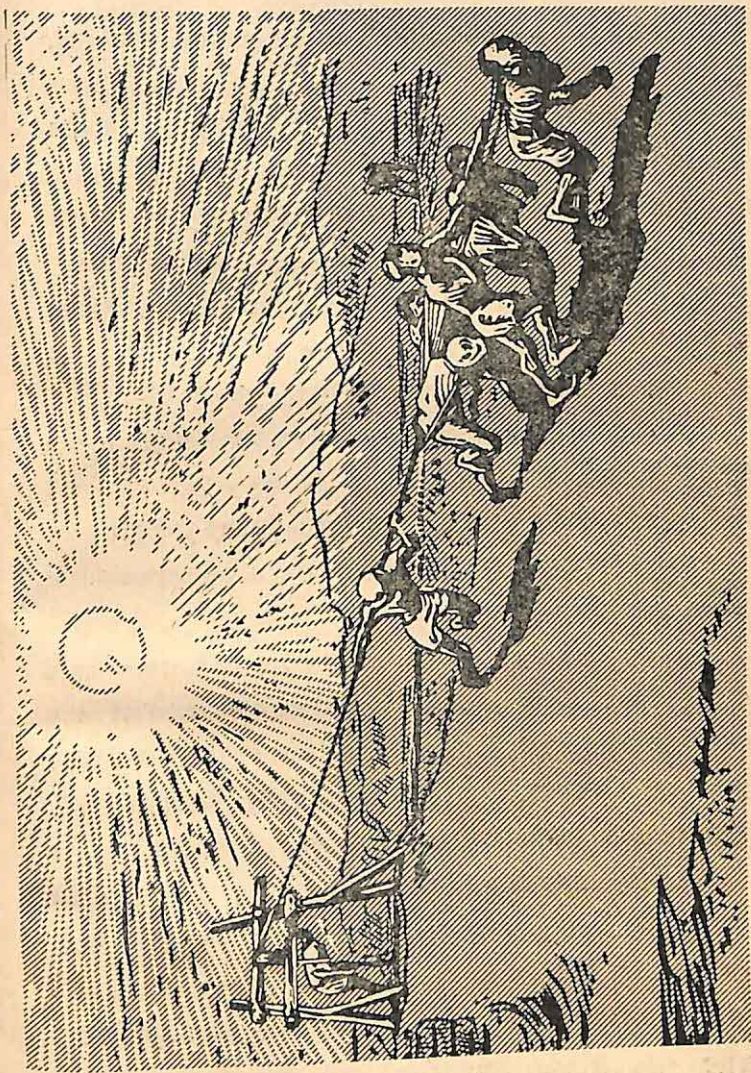
দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে চীন কৃষকের জীবনসংগ্রাম (চীন উডকাট) ঃ শিল্পী—কু য়ুআন

আমাদের মধ্যে যে এ প্রস্তাবে রাজি না হবে সে মানুষের বাচ্চা নয়, বুঝলে ?'

'কুচপরোয়া নেই, আমি রাজি! সেই লম্বা কৃশতনু মেয়েটির ভাব চালচলন—মন্দ নয়, কি বল ?'

সকলেই হেসে ফেটে পড়ল এবং ক্ষুধাতুর ও ঈর্ষাতুরদের মত সাগ্রহে প্রস্তাবটা সমর্থন না করে পারল না।

'এসো একটা কিছু শুরু করে দেওয়া যাক! অনেক দিন মেয়েমানুষ ছাড়াই আমাদের কেটেছে, এবারে আমাদের পালা! চল যাই! যে আমাদের দলে যোগ দেবে না সে কচ্ছপের বাচ্চা, কুকুর!'

জ্যান্ত-ভূত লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে নাচতে শুরু করে দিল। এই সব নির্লজ্জ কথা তার মনে ধরেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে একটা দমকা বাতাস এসে তার উদ্যত বক্তৃতাটা নষ্ট করে দিল। তাদের চারপাশে হলদে বালি একটি চাঁদোয়ার আকারে বাতাসের তোড়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার তাদের ঢেকে ফেলল। ...

দুর্বৃত্তদের মতলব যে অবিলম্বেই লাও-চি'র মারফতেই প্রকাশ পেয়ে গেল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ফলে নারী-সৈন্যেরা অগোণেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। হুয়াং লাও-তিয়েও আর তার উপরওয়ালাকে দেখতে পেল না। এককথায়, সকলেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দক্ষিণাঞ্চলের লোকগুলি হেরে যাচ্ছে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

এই পরিবর্তনের ফলে জ্যান্ত-ভূত ও তার গুণ্ডার দলটি আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাল না। বসন্ত-দাগা-মুখো লী-কে কে মেরেছে তা প্রথমটা কেউ জানতে পারে নি ; কেউ কেউ অনুমান করেছে যে, তার অসতর্ক কাজের জন্যেই স্থানীয় গুণ্ডারা তাকে শাস্তি দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এই মতও পোষণ করে যে,

গোবেচারী স্ত্রীই তার এই বিপদের মূল কারণ। তারপর চ্যাং-দের ঘরের মেঝের নীচে বেশ কিছুটা গম চুরি হল। কে বা কারা এ কাজ করল? প্রত্যেকেই সন্দেহ করল যে, লুণ্ঠনকারীরা সকলেই তাদের গ্রামের লোক, কিন্তু বুড়ো চ্যাং একটি কথাও বলল না।

হুয়াং লাও-তিয়ের জীবনে নানা রকম নতুন নতুন অশান্তি দেখা দিল। সে যখন রাস্তায় বেরোয় তখন সে লক্ষ্য করেছে তার অধিকাংশ প্রতিবেশীই তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চায় না, বরং দূর থেকেই মুখের একটা পাশে একটা অবজ্ঞা মেশানো কৃত্রিম হাসি হাসে।

ধরিত্রীদেবীর মন্দিরে যে চারজন সৈন্য মোতায়েন ছিল, একদিন দেখা গেল তারা অন্তর্ধান করেছে। ব্যাপারটি সত্যিই গুরুতর। গ্রামময় নানা রকম অদ্ভুত গুজব ছড়িয়ে পড়ল এবং গুজব ছাড়াও বেপরোয়া লোকগুলির সঙ্গে হাতাহাতি সুরু হল—অথচ কেউ কিছু জানে না বলেও মনে হয়। যারা আহত হল, জ্যান্তভূত তাদের অন্যতম। সেও আজ পালিয়েছে। গ্রামের নবগঠিত সমিতির সভ্যোরা গুণ্ডাদের প্রতি-আক্রমণ করায় কয়েকজন হতাহত হল। রাত্রিতে একজায়গায় আগুন লাগল। গোপনে আগুনের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে কে একজন ধরিত্রীদেবীর মন্দির দেখিয়ে দিল এবং সে হামাগুড়ি দিয়ে পরম সান্ত্বনা নিয়ে নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরল।

পরদিন সকালে উত্তরাঞ্চলের একদল সৈন্য গ্রামের এক প্রান্তে এসে হাজির হল। সেনাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জমিদারের গোমস্তাদের ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠাল কিন্তু কোন গোমস্তাকেই পাওয়া গেল না। ইশ্‌তেহার বিলিকারী সৈন্যদের আসার আগেই তারা সকলে প্রাণ-ভয়ে তড়াতাড়ি গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে। আর তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ভদ্রলোকও পালিয়েছে। বুড়ো হুয়াং অসুস্থ হয়ে বিছানা

ছাড়তে পারেনি বলে পালায়নি। খবর পেয়েও সে সামরিক ঘাঁটিতে হাজিরা দিতে পারল না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যে চ্যাং-এর বাড়ীতে চুরি হয়েছে তাকেই হাজিরা দিতে হল।

একটা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সকলেই তার তদন্তে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

জন কয়েক নবাগত সৈন্য খোলা জায়গায় তাঁবু গাড়বার চেষ্টা করল। তারা সকলেই দেখতে লম্বা চওড়া, উত্তরাঞ্চলের কথ্য ভাষায় কথা বলে। সঙ্গে করে ইশ্‌তেহারও এনেছে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তা মোটেই বিলি করল না।

তাদের একদল গিয়ে হুয়াং লাও-তিয়ের রুগ্নশয্যার পাশে উপস্থিত হয়ে তাকে উঠতে আদেশ করল। অত্যন্ত অসুস্থ হলেও বুড়ো এবার হুকুম অমান্য করতে পারল না। তাকে ও তার ছেলে লাও-সানকে ধরে নিয়ে গেল। হুয়াং লাও-তিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! দূরে মাটিতে একটি চেনা নিশান উড়ছে দেখেই সে কিছুটা ভরসা পেল।

'তুই কে রে?' একজন অধ্যক্ষ জানতে চাইল। লোকটা দ্বিধা বিভক্ত দাড়ি পরেছে, বুড়ো তাতেও কিছুটা আশ্বস্ত হল।

হুয়াং লাও-তিয়ে সত্যি কথাই বলে ফেলল।

'ও কি তোরই ছেলে?' লাও-সানকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হুয়াং লাও-তিয়ে মাথা নেড়ে স্বীকার করল।

'আর একটা ছোট ছেলে আছে না?'

'হাঁ, কিন্তু কাল রাতে লাও-চি বাড়ী ফেরে নি,' বুড়ো বলল।

অধ্যক্ষ যে তা জানে সেটা তার হাসি থেকেই বোঝা গেল। সহকারীদের দিকে মাথা নেড়ে পাশের রিভলভারটার দিকে একবার

তাকাল। হুয়াং লাও-তিয়ে ও তার পুত্র লাও-সান দুজন সৈন্যের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল। অবিলম্বেই সুষ্ঠুভাবে তাদের হত্যা সমধা হল।

সেই দিন বিকেলেই সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের সঞ্চিত খাদ্যসম্ভার সব কেড়ে নিল। বসন্ত দাগা-মুখো লী-র বাড়ীতে একটা শূয়োর পেল, চ্যাং-এর ভাঁড়ার ঘরের মেঝের নীচে আরও অনেকটা গম পাওয়া গেল এবং আর আর কুঁড়ে থেকেও নানারকম দ্রব্যাদি আহরণ করে তারা সব সরে পড়ল। গ্রামবাসীদের কাছে এদের আচরণ খুব স্পষ্ট করেই বোধগম্য হল। এরা সৈন্য, সুতরাং সৈন্যের মত আচরণ করল। দেখতে দেখতে সব কিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

লাও চি'র জামা-কাপড় রক্তে ভিজে গেছে। গ্রামের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে সে পড়ে আছে। মাথা ঘুরছে, দু হাতে সেটা ধরে আছে। সে বুঝতে পারছিল যে, তার সর্বাঙ্গ বেঁকে যাচ্ছে, একবার উপরের দিকে আর এক বার নীচের দিকে। মধ্যে মধ্যে কল্পনায় তার চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল সেই সুন্দরী তরুণীর মুখখানি—তার দু-খানি অনাবৃত প্রসারিত হাতে সে দুজনার হাত চেপে ধরে আছে—তাকেই যে সাম্যবাদীদের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে ও আজ এ বিপদে পড়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

স্বপ্নে আবার সেই তরুণীটির আবির্ভাব হল বল মনে হল। কিন্তু এই বলে সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ঃ

'সব ফাঁকি! সব ধাপ্পা! তেরি...!'